মরণের পরে

রাখালদাস সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ

মরণের পরে

রাখালদাস সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
(প্রকাশনী বিভাগ)
খড়দহ, ২৪ পরগণা

প্রকাশক :—

শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

পোঃ অঃ—বলরাম ধর্মসোপান

খড়দহ, ২৪ পরগণা।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, পোঃ অঃ—বলরাম ধর্মসোপান
খড়দহ, ২৪ পরগণা

২। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান (কলিকাতা শাখা),
১০১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

প্রথম মুদ্রণ—১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, শ্রীরামজয়ন্তী

মূল্য—২·৫০

শ্রীধর্মসোপান প্রেস, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিচায়িকা

অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিরও একটি ভূমিকা প্রয়োজন। তবে ইহার পৃথক কোন ভূমিকার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার নিজেই তাঁহার প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদে (লেখকের কথা, পটভূমি) অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থের ভূমিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন।

জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলবাদ—এই দুইটি বাদ হইতেছে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। এখন ক্রমশঃ অন্যান্য ধর্মবাদীরাও এই দুইটি বিষয়ে বিশ্বস্ত হইতেছেন। নিজ নিজ কর্মানুগুণ সুর নর তির্যগাদি জীবগণকে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই দেহত্যাগই জীবের মরণ, জীবাত্মার মরণ নাই, সে কিন্তু নিত্য। সাপের খোলস ছাড়িলে যেমন তাহার মৃত্যু হয় না সেইরূপ আত্মা এই স্থূল দেহ ত্যাগ করিলে তাহার মৃত্যু হয় না, স্থূল দেহ ত্যাগ হয় মাত্র। এই মরণের পরে এবং পরবর্ত্তী জন্মের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্ত্তী কালে জীবাত্মা একটি অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দেহ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। এই দেহকে বলা হয় আতিবাহিক দেহ। এই অবস্থাটি উক্ত দুটি জন্মের সংযোগসূত্র বা সন্ধিস্থল। জীবের সূক্ষ্ম দেহধারী এই অবস্থাটি হইতেছে 'মরণের পরে' এই গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু। এই অবস্থাকেই 'প্রেত অবস্থা' বা 'ভূতাবস্থা' বলা

হইয়া থাকে। জীবের এই প্রেতদশাটি তাহার কর্মানুগুণ দীর্ঘকাল বা অল্পকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। স্থূলদেহ যেমন পাঞ্চভৌতিক এই সূক্ষ্মদেহও সেইরূপ পাঞ্চভৌতিক। সূক্ষ্ম বলিয়া ইহার গতিবিধি ক্ষিপ্র অনায়াস এবং বহু বিস্তৃত।

এই গ্রন্থখানি কেবল ভৌতিক কাহিনী নহে। স্থূলদেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মদেহ ধারণকালে মানুষকে (আত্মাকে) অনেক প্রকার সূক্ষ্ম বস্তু লইয়া যাইতে হয়। কৃতকর্মের ফল মন বুদ্ধি অহঙ্কার, এই সকল কর্মের কর্তৃত্বের অভিমান হইতে যে সকল সংস্কার বা দোষের সৃষ্টি হয় সেই সকল দোষযুক্ত মন এবং এই দূষিত মনের জন্য বিভিন্ন গতি ও প্রবৃত্তি—এই সকল সূক্ষ্মবস্তুও সূক্ষ্মদেহের সঙ্গেই অবস্থান করে। কেবল এই প্রেত অবস্থার বর্ণনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। প্রেতরূপী জীবের অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন উপায়—ভূতবিদ্যা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, বিশেষ বিশেষ দিব্যদেশে পিণ্ডদান প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় বিধানের আলোচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত।

এই প্রেত-অবস্থাটি ইন্দ্রিয়-অগোচর হইলেও ইহারা যোগিগণ এবং পরিশুদ্ধ মনোবৃত্তি সম্পন্ন সাত্ত্বিকগণের ইন্দ্রিয়গোচরীভূত। আবার এই প্রেতগণও, যখন ইচ্ছা বলবতী হয় তখন, তাঁহাদের এই ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মদেহকে মানব নয়নের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর ৫।৭ দিন পরে তাহার পুত্র (নরেন্দ্র) মৃত পিতার জীবন-বীমার টাকা উদ্ধারের জন্য বীমা

অফিসে যাইয়া বীমার কাগজপত্র দেখাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার পিছন হইতে একটি কণ্ঠস্বর তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন—'নরেন, জীবন-বীমার কাগজপত্র সমস্তই তুমি যে আপিসে ফেলিয়া আসিয়াছ!' তিনি বুঝিতে পারিলেন এই স্বরটি তাঁহার মৃত পিতার কণ্ঠস্বরই। তিনি সবিস্ময়ে পিছনে ফিরিয়া তাকাইলে দেখিলেন তাঁহার মৃত পিতারই মূর্ত্তি, দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত। পরে তিনি দেখিলেন যে সত্যই তিনি বীমার সমস্ত কাগজপত্র আপিসে ফেলিয়া আসিয়াছেন। তখনই আপিসে ফিরিয়া গিয়া সেগুলি লইয়া আসিলেন। এই ঘটনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রেতগণ পূর্ব সম্বন্ধের স্মৃতি ও মমত্ব সহসা ভুলিতে পারেন না, পূর্বসম্বন্ধীদের সুখ সুবিধার জন্য এই অবস্থাতেও তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

এই গ্রন্থের রচয়িতা একজন সুপণ্ডিত অনুভবী ধার্মিক পুরুষ, একজন খ্যাতিমান লেখক। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয় অগোচর ও দুর্জ্ঞেয় হইলেও সুদক্ষ গ্রন্থকারের সুবিন্যস্ত ভাব, সরল ভাষা এবং সুমধুর প্রকাশ ভঙ্গিমায় ইহা যে সাধারণের নিকট হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গ্রন্থটি ইতিপূর্বে উজ্জীবন মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ইহার গ্রন্থাকারে প্রকাশ লেখক দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

এইরূপ গ্রন্থ কেবল যে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করে তাহাই নহে, ইহা তাহাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের বিশ্লেষজনিত ক্লেশ প্রশমনেও সহায়তা করে। এতদতিরিক্ত ইহা পাঠকের আস্তিক্য বুদ্ধি ও ধর্মবুদ্ধির পুষ্টি সাধনেরও সহায়ক। এই প্রকার গ্রন্থই ইন্দ্রিয়গোচর জড়জগৎ এবং ইন্দ্রিয়-অগোচর ধর্মজগতের যোগসূত্র।

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য্য

খড়দহ
ফাল্গুনী পূর্ণিমা
১৩৭৪
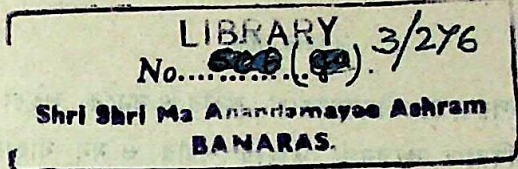
লেখকের কথা

মনে করিয়াছিলাম বাঁচিয়া থাকিতে 'মরণের পরে' লিখিব না, কিন্তু অনেকের ইচ্ছা আগ্রহ বা অনুরোধে লিখিতে হইতেছে।

এখানে একটা কৈফিয়ৎ—গত বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ায় শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের উৎসব অবসান হওয়ার পর যখন বিদায় লইতেছি, তখন আশ্রমের অধিপতি বলিলেন—"উজ্জীবনে* কিছু লেখা দিতে হবে।"

আমি লিখিতে পারি, কিন্তু লেখার মত লিখিতে পারি না—যাহা অপরের পাঠ্য হইতে পারে। তথাপি লিখি। সে সকল যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন বা পছন্দ করেন তাঁহারা পড়েন। অপরে কি মনে করেন জানি না। সেইজন্য উজ্জীবনে লেখা দিতে অসামর্থ্য জানাইলাম, কিন্তু গৃহীত হইল না।

তখন—শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজকে মনে মনে নিবেদন করিলাম। জবাবও মিলিল মনের মধ্যে। মনে হইল, তিনিই যেন বলিলেন—"তুমি আয়ুর্বেদেই লিখিবার বিষয়বস্তু পাইতে পার। আয়ুর্বেদ অন্যান্য চিকিৎসাগ্রন্থের মত চিকিৎসাশাস্ত্র নহে। আয়ুর্বেদ বেদেরই অঙ্গবিশেষ। বেদ আত্মার অস্তিত্ব, নিত্যত্ব, কর্ম, কর্মফল, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানগ্রন্থ। আয়ুর্বেদেও এ সকল বিষয় আছে।

* উজ্জীবন শ্রীবলরাম ধর্মসোপান আশ্রম হইতে ১৩৬০ বঙ্গাব্দ হইতে প্রকাশিত ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা।

তাহা ছাড়া—পরমাত্মা জীবাত্মারূপে শরীর ও মনকে লইয়া মনুষ্য-মূর্ত্তি লইয়া বিরাজ করেন। তাঁহার শরীর ও মন যাহাতে স্বস্থ থাকিয়া ভগবৎ-সেবার উপযোগী হইতে পারে সে-সকলের ব্যবস্থা ও উপদেশ আয়ুর্ব্বেদেই আছে, অন্য কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। তাহা ছাড়া—মানুষ মরে না, মরণের সঙ্গে মানুষের সব কিছুর বিনাশও হয় না। সদসৎ কর্ম্মের ফলে আবার তাহাকে দেহ ধারণ করিয়া বিবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অধিকন্তু অসৎ কর্ম্মের ফলে দেহত্যাগের পরেও বিবিধ যাতনাময় দেহ ধারণ, অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়; যদিও এ সকল বিষয় অন্যান্য শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে এ সম্বন্ধে কি আছে তাহা লোকে জানে না। আর একটা কথা—মানুষ দেহত্যাগের কালে এই দেহ হইতে কি কি লইয়া যায়, তাহাও জানে না। তুমি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র হইতে এ-সকলের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রভৃতি এবং ইহলোকে মানুষের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কিছু সংবাদ সকলকে জানাইতে পার। বর্ত্তমানে আত্মা সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণা নাই। আবার যাহাতে ভারতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা হয় তাহার জন্য কিছু করাও আবশ্যক, নতুবা বিলাতী শিক্ষা ও জড়বিজ্ঞানের প্রভাবে ভারতের বৈশিষ্ট্য লোপ পাইবে।”

আমার মনের মধ্যে অচিন্তিতভাবে এই ভাবনা উদিত হওয়ার ফলে, আমি 'মরণের পরে' লিখিতে বসিয়াছি, জানি না ইহা আমার কল্পনামাত্র কিনা।

*

মরণের পূর্বে জীবনে যে সকল কাজ মানুষ করে তাহা অনেক দেখিয়াছি। সেই মানুষই মরণের পরে কি করে, কেমন তার অবস্থা, অথবা মানুষের মরণের সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায় কি-না—যেমন ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপনের সকল লীলা খেলার শেষ,—এই সমস্ত জানিবার জন্য কাহারো আগ্রহ আছে কি না জানিনা, আমার আছে অত্যাগ্রহ।

আমার তখন আয়ুর্বেদের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থসকল পড়া শেষ হইয়াছে,—পড়ি বেদান্ত। থাকি কবিরাজ মহাশয়েরই বাড়ীতে। কেননা, তখন আয়ুর্বেদবিদ্যা এখনকার মত কিনিতে হইত না। তখন ভারতে ভারতীয় ভাব নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আহার, বাসস্থান, বিদ্যা সবই বিনামূল্যে। স্নেহ অপত্যনির্বিশেষে। আর আমিও তখন "অনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ" সর্বপ্রকারে নিঃস্ব।

একদিন একটি রোগীর আত্মীয় আসিয়া কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া গেল। আমিও ছিলাম সঙ্গে, রোগ বাতশ্লেষ্মবিকার, অবস্থা মরণের পূর্ব। বাহ্যজ্ঞানবিমূঢ়, প্রলাপ বাক্য। রোগীর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ নির্দেশ করিতে হইবে, কেননা, রোগীকে তেতলা হইতে নামাইয়া একতলায় উঠানের মধ্যে শোওয়াইয়া না দিলে—তেতলা ত্রিশূন্যে মৃত্যু অবাঞ্ছনীয়, তাহাতে রোগীর পরলোকে গতি হইবে না।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—"রাত্রে রোগীর কাছে থাকিবে আমার এই শিষ্য, আমি থাকিব দিনে, সমস্ত রাত্রি জাগা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

রোগী থাকিত বড়বাজার হ্যারিসন রোডে। আমি আহারান্তে রাত্রে গিয়া সেখানে রোগীর পাশেই বসিয়া থাকিতাম। অবস্থা খারাপ দেখিলে তৎকালে প্রতিকারক ঔষধ দিতাম। উদ্দেশ্য, রাত্রিতে রোগীর মৃত্যু না হইয়া দিনে হইলে তখন কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং থাকিবেন, মৃত্যুর দুরূহ পূর্বক্ষণ নির্দেশ তিনিই করিবেন। আর আমারও তখন বিদ্যা প্রায় পুঁথিগত।

রাত্রে রোগীপার্শ্বে বসিয়া আছি। রোগী আপন মনে প্রলাপ বকিতেছে। বক্তব্য,—"তিন রূপেয়া ছে আনা নহী হোগা, দশ আনাই দেনে হোগা" ইত্যাদি প্রলাপকে শাস্ত্রে বলে "অসঙ্গত বাক্য"। বাক্য সঙ্গত অসঙ্গত সবই আপেক্ষিক। কিন্তু যে বলে তার কাছে সবই সঙ্গত। এজন্য তাহার প্রলাপ বাক্যও আমি মন দিয়া শুনিয়াছিলাম রোগীর মানসিক অবস্থা জানিবার জন্য।

বেদান্ত-দর্শনে পড়িয়াছিলাম—"রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ", দেহ হইতে জিগমিষু আত্মার এই সম্পরিষ্বক্তি কাহার সহিত? জলৌকা যেমন অপর তৃণখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আশ্রিত তৃণখণ্ড ত্যাগ করে, আত্মাও তেমনি আতিবাহিক দেহকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত দেহকে ত্যাগ করে শুনিয়াছি। ভালই হইল—আতিবাহিক দেহ কেমন, আত্মাই বা তখন কেমন, জানিতে চেষ্টা করা যাইবে।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার চরক-সংহিতায় লিখিয়াছেন—

ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈঃ
মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।

কর্মাত্মকত্বান্ন তু তস্য দৃশ্যং
দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপম্ ॥

মানুষের মৃত্যুকালে বিরচিত আতিবাহিক দেহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্থূল পাঞ্চভৌতিক উপাদানে গঠিত। চক্ষুর দ্বারা সে দেহ দেখা যায় না, সেজন্য তাদৃশ দেহে অবস্থিত আত্মাকেও কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন যোগী তপস্বী, তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইয়া থাকেন। এই কথা সুশ্রুতও বলিয়াছেন, যথা—

"ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং দেহে সূক্ষ্মতয়া বিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভি স্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ ॥"

আমার জ্ঞানচক্ষু তপশ্চক্ষু দিব্যদৃষ্টি কিছুই নাই। কাজেই আত্মাকে দেখার বালাই কিছুই নাই। তবে—মানুষের জাগ্রৎ অবস্থা দেখিয়াছি, নিদ্রাভঙ্গে নিজের স্বপ্নগত আত্মাকেও দেখিয়াছি। যে আত্মা জাগিয়া থাকিয়া সকল কর্ম কলহ বিবাদ করে, সেই আবার স্বপনে কত কি করে। স্বপন ভাঙ্গিয়া গেলে আবার যে কে সেই, এখন সেই আবার দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় কি করে দেখিতে দোষ কি? কাজেই তাহার প্রলাপবাক্য আমি মন দিয়া শুনিতাম, যাহা অপরের কাছে প্রলাপ অসঙ্গতবাক্য তাহার সঙ্গতি একটা আমার কাছে ছিল।

সাধারণ লোকে বলে, মরণের পূর্বে মানুষের যখন অজ্ঞান অবস্থা তখন যমের বিচার হয়। চিত্রগুপ্ত খাতা খুলিয়া মরণোন্মুখ ব্যক্তির সর্বজীবনে কৃত সদসৎকর্ম, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, ধর্ম, অধর্ম, বাসনা কামনা সব কিছু বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাকে যে প্রকার

দেহ ধারণ করিতে হইবে তাহা নির্দেশ করিয়া মনোময় সূক্ষ্ম দেহের সহিত আত্মাকে গাঁথিয়া দেয়—যাহা মরণের পর স্বর্গনরক-রূপে সূক্ষ্মদেহে ভোগ করিতে হয় এবং পুনরায় দেহধারণকালে ভাগ্যরূপে তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। এইজন্য শাস্ত্র বলেন, "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।" ইহাই প্রাক্তন কর্মফলরূপে আসিয়া মানুষের ইহজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এই প্রলাপ বাক্য মন দিয়া শোনার ফলে মানুষের মরণের পরে কি হয় তাহা জানিবার জন্য আমার যে কৌতূহল জন্মিয়াছিল তাহারই জন্য মরণের পরে মানুষের কি হয় তাহা জানিবার আমার অত্যাগ্রহ। অতঃপর যাহা আমি শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি তাহাই অকপটে লিখিয়া যাইতেছি। বিশ্বাস করা বা না করা পাঠকের ইচ্ছা।

মানুষের একটা সাধারণী—প্রবৃত্তি, যাহা সে দেখে নাই, জানে না, বোঝে না, তাহা সে মানে না। কিন্তু মানুষের দেখা শোনা জানা বোঝার পরপারে যে কত কি আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অবজ্ঞা অবিশ্বাস বোধ হয় অভারতীয়। কেননা, প্রাচীনকালে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমানের মত আপ্তবাক্যও প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইত না। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—"সর্বোহি বুদ্ধিমতাং আচার্য্যঃ শত্রুস্তু অবুদ্ধিমতাম্", যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা সকলকেই আচার্য বলিয়া মনে করে, আর বুদ্ধি-হীনেরা সকলকেই শত্রু মনে করে। বর্ত্তমানে সকলেই নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও বুদ্ধিমান মনে করে না। কাজেই সে নিজের

কথা ছাড়া অপরের কথা মানে না। তবে শুনিতে দোষ কি? ইহা মনে করিয়া কেহ হয়তো পড়িতে পারে, এই প্রত্যাশায় আমার এই কয়েকটি অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

*

প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি ইংরাজী জানা পণ্ডিত নহি। হিন্দুর অধ্যাত্ম দর্শন, আমি নিজের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পড়িয়াছি। তাহার সব কিছু ভালভাবে জানিতে পারি নাই। যাহা জানিয়াছি, যাহা বুঝি নাই, তাহা আমার মনের মত ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি।

উজ্জীবন-সম্পাদকের অনুরোধে একটা লেখা দিতে হইবে বলিয়া কতকগুলি অদ্ভূত বা ভূতের সংবাদ লিখিতে বসিয়াছিলাম। লিখিতে লিখিতে এতদূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে, যাহা মরণের পূর্বে সম্ভাবনা ছিল না। তারপর এক একটি সংবাদ কে যেন আমায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে বা বলিয়াছে। কে বলিয়া দিয়াছে তাহা জানি না। কেননা মানুষ দেখি নাই, অথচ কথা শুনিয়াছি, দেহের কাণে নয়, মনের কাণে।

তাহা ছাড়া কতকগুলি পুস্তক আসিয়াছে, অচিন্তিতভাবে কাহারো না কাহারো হাত দিয়া। আশ্চর্যের বিষয়, কাহারও নিকট আমি এ সম্বন্ধে কোন পুস্তক চাহি নাই। পুস্তকগুলি মরণের পরের সংবাদে পূর্ণ—বিদেশীয় ও এদেশীয় পণ্ডিতগণের অভিমতসহ। লেখা-গুলি পড়ার পর আবার আমি সন্তদাস বাবাজী মহারাজের পূর্বাশ্রমে তারাকিশোর চৌধুরী অবস্থায় লিখিত সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন এবং

আয়ুর্বেদের অধ্যাত্মবিষয়ক নিবন্ধ সকল পড়িয়াছি। কিন্তু এবার আমার মনে হইয়াছে, এভাবে ব্যাখ্যা বা অর্থসঙ্গতি আমার পূর্বে মনে হয় নাই। সবই একটা অপূর্ব অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভাণ্ডার।

এই অবস্থায় শ্রীগুরুকৃপায় আমি বহু সঙ্গত প্রশ্নের জিজ্ঞাসু হই। সে সকল প্রথমে আমার মনের খেয়াল বলিয়া মনে হইয়াছিল। তারপর স্বামী অভেদানন্দ লিখিত একখানি পুস্তক পাই। তাহাতে আমার মনের খেয়ালী প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। যাঁহারা অজানাকে জানিতে চাহেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাহিরে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের সন্ধান পাইতে চাহেন, তাঁহাদের অন্ততঃ অবসর সময়ে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই সকল পুস্তক একবার পড়িয়া দেখিলে ভাল হয়।

পাশ্চাত্ত্য মনীষী ও এ দেশীয় তত্ত্বদর্শী গ্রন্থকারগণের যে কয়খানি পুস্তক আমি পড়িয়াছি তাহাতে আমার একটা খেদ আছে। কোথাও মরণের পরে দেহমুক্ত মনের বন্ধনে বদ্ধ আত্মার যে এতাদৃশী দুর্গতি তাহার কারণ বা প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে কোন নির্দেশ পাই নাই। অথচ হিন্দুর যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র ও অধ্যাত্ম দর্শনে এ সকলের কারণ ও প্রতীকারের উপায় সকল বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ও গরুড়পুরাণে। কিন্তু সে সকল এখন অচল, কেননা, এই সকল বাক্য বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন লোক সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। তবে কবি ভবভূতির কথায় বলা যায়, "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।" হয়তো এমন কাল ফিরিয়া আসিবে, যখন পুনরায় হিন্দুর অধ্যাত্মদর্শন ও ধর্মশাস্ত্র শ্রদ্ধা

সহকারে সম্মানিত হইবে। আমি মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি এবং ভাগবতী লীলার ক্ষেত্ররূপে দিল্লী আগ্রা ও গৌড়ের বাদশাহগণের কীর্ত্তি সকল দেখিয়াছি, ঐতিহাসিক-দৃষ্টিতে নহে, কোন এক অলক্ষ্য অপ্রত্যক্ষ দেবতার লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বিশ্বপরিচালনা দেখিবার জন্য। আবার যদি প্রবল পরাক্রান্ত বিজাতীয় ভাবধারার বন্ধন মুক্ত হইয়া ভারত স্বাধীন হইতে পারে, তাহা হইলে, কে বলিবে ভারতের প্রাচীন ঋষি মহর্ষিগণের তপস্যালব্ধ জ্ঞানের সমাদর হইবে না? ভাগবতে আছে, "সংসার-আধাবতি কালতন্ত্রঃ"। অনাগত কালের কক্ষপুটে কি আছে তাহা প্রত্যক্ষদর্শী অহংসর্বস্ব পণ্ডিতগণ কি করিয়া বুঝিবেন? সেই জন্য মনে হয়, ভারত আবার কালবশে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়া দিতে পারে। সেই জন্য মহর্ষি আত্রেয়ের কথা মনে হয়—

বুদ্ধিমান্ নাস্তিক্যং জহ্যাৎ-বিচিকিৎসাং চ।

অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের উচিত, আমি যাহা জানি, তাহার বাহিরে আর কিছু নাই এ ধারণা ত্যাগ করা এবং ঋষি মহর্ষিগণ প্রণীত শাস্ত্রবাক্যের প্রতি সংশয় ত্যাগ করা।

এখন আমার নিবেদন, যাহা বলিতে গিয়া অবাস্তব ভাবস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, মরণের পরে মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পড়িয়া দেখিলাম মানুষের মরণ নাই, আছে দেশত্যাগের মত দেহত্যাগ। কিন্তু দেশত্যাগী পুনরায় দেশে ফিরিলে তাহাকে চিনিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না, যেহেতু সে যে দেহে দেশত্যাগ করিয়াছিল সেই দেহেই ফিরিয়া আসে। আর যে মৃত্যু বা দেহ-

ত্যাগের পর পুনরায় ফিরিয়া আসে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে, সে আর পূর্বদেহে ফিরিয়া আসে না এবং কতকাল পরে আসে, তাহার নির্দিষ্ট কোন সময়ও নাই। অধিকন্তু মানুষমাত্রেই স্বীয় ভ্রান্তিপূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে—যে গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না। বাহ্যদৃষ্টিতে ইহা সত্য, যাহারা দেহকেই মানুষ বলিয়া মনে করে, তাহারা একবারও মনে করে না, মানুষ অর্থাৎ আত্মা দেহহীন, অতীন্দ্রিয় অমর মানুষ আর মানুষের দেহও এক নহে। যদি খোলস ছাড়িলে সাপের মৃত্যু হইত, তাহা হইলে, দেহত্যাগ করিলে মানুষের মৃত্যু বা বিনাশ হইয়াছে, তাহা বলা চলিত, কিন্তু তাহা মোটেই নহে। এই কথা হিন্দুর যাবতীয় ইতিহাস পুরাণ ধর্মশাস্ত্র এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অসংশয়িত ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।—মানুষ (আত্মা) মরে না, মরিতে পারে না। ভগবান একাই বহু হইয়া বহু দেহ ধারণ করিয়া বৃক্ষলতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী মানুষ কত কি হইয়াছেন। মানুষ প্রভৃতির দেহের বিনাশ আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা-রূপে যে ভগবান্ আছেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, তিনি অবিনশ্বর।

স্মৃষ্টি-রহস্তের মূলে দেখা যায়, স্বয়ং কর্ত্তা ভগবান্ সৃষ্টিকালে একটি মায়ার আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন এবং সেই মায়াকে আশ্রয় করিয়া তিনি জীব জন্তু মানুষ, দেবতা, ভূত প্রেত কত কি হইয়াছেন—যেমন বাজীকরের বাজী দেখিবার সময় সত্য, পরে মিথ্যা। যাদুকরের টাকায় পকেট ভরিয়া বাড়ী গিয়া দেখা যায় পকেট শূন্য। তেমনি মহাপ্রলয়ে যাদুকর বিশ্বপতির যাদুরচিত বিশ্বে কিছু নাই, গাঢ় নিবিড় হইতে নিবিড়তম অন্ধকার। কিন্তু সত্যদর্শী ভাগবত

বলিয়াছেন (৮।৩।৫)—

"কালেন পঞ্চত্বমিতেষু কৃৎস্নশো
লোকেষু পালেষু চ সর্বহেতুষু
তমস্তদাসীৎ গহনং গভীরং
যস্তস্য পারেঽভিবিরাজতে বিভুঃ।"

অর্থাৎ কালক্রমে মহানির্বাণ প্রলয়ে সব কিছু বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, যখন গভীর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না, তখন সেই গহন গভীর নিবিড় অন্ধকারের পরে এমন একটা কিছু থাকে যাহা অবিনশ্বর, তাহাই যাদুকরের নগ্নমূর্ত্তি।

স্ষ্টিকর্ত্তা বিশ্বসৃষ্টির সময়ে যে মায়াকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারই নাম—প্রকৃতি বা মহামায়া। অতএব সত্য পুরুষ আর মিথ্যা প্রকৃতিতে মিশিয়া বিশ্বের যাবতীয় বস্তু জড় ও জীব। মানুষও জীব। এই জীব বা মানুষের সত্য-অংশ আত্মা আর মিথ্যা অংশ দেহ। তাহা আবার দ্বিবিধ—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। স্থূলের যেমন বিনাশ সূক্ষ্মের তেমন নহে, সেজন্য আত্মা বা মানুষ যখন স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যায়, তখন সূক্ষ্ম দেহকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায় এবং আবার যখন স্থূলদেহ ধারণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে তখন সেই সূক্ষ্মদেহ লইয়াই আসে। আমরা কিন্তু স্থূলের উপাসক। আমাদের যাহা কিছু সবই স্থূল। স্থূলের মধ্যে যে সূক্ষ্মের নিবাস, ঘটের মধ্যে যে মাটির নিবাস, তাহা আমরা কোনদিনই ভাবি না। এমনটি ঘট আছে, মাটি নাই, মাটি আবার কোথায়? এই দেখনা—মাটি কোথায়? ঘটই তো আছে, তোমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জ্ঞানকে অবিশ্বাস কর? দ্রষ্টা তো আমারই মত সত্যদ্রষ্টা?

সেও স্বীকার করিল—ঘটই সত্য, মাটি মিথ্যা। ইহাও মহামায়ার মায়া, এই মায়া অনাদিকাল চলিতেছে, যাহার জন্য উপনিষৎ বলিয়াছেন—"অনাদিসংসারবিপরীতভ্রমাৎ সত্যং মিথ্যা ইব প্রতিভাতি, মিথ্যা নঃ সত্যমিব।" কাজেই মরণে মানুষের দেহের বিনাশ দেখিয়া বিনাশবিহীন আত্মারও বিনাশ ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হওয়া কে রোধ করিবে? নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রকে বিশ্বাস কয়জনে করিতে পারে? স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস, মায়াবাদের আবিষ্কর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাস, শুকদেবের বনবাসকালে কি করিয়াছিলেন? বনবাস মৃত্যু নহে, দেহত্যাগ নহে, বাসত্যাগ। তাঁহার যদি এই অবস্থা হয়, যাঁহার জন্য বৃক্ষলতাও কাঁদিয়া আকুল হয়, তবে সাধারণ মানুষ, যে মহামায়ার ক্রোড়ে লালিত পালিত, তাহার দশা কি হইবে? তথাপি—মহামায়া তো মা-ই। মায়ের স্নেহকাতর হৃদয় সন্তানের জন্য কাঁদিবে, ইহাও মহামায়ার মায়ায় হইতে বাধ্য। সেইজন্য মাতৃহারা আপনভোলা মানুষ যখন জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সুখ-দুঃখের আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইতে হইতে কাতর কণ্ঠে বলে,—মা জগদম্বা আর পারি না, চরণে শরণ দে মা! রক্ষ মাং মধুসূদন! তখন স্বয়ং জগদম্বা আসিয়া দুঃখগ্রস্ত সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলেন—মাভৈঃ, ভয় কি, এই যে তুমি আমার কোলে। ইহাই দিব্যজ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয় যাহার হয়, সেই তখন দেখিতে পায়, জানিতেও পারে সবই মায়ের খেলা। বিশ্ব মহামায়ার লীলাভূমি।

মানুষের জীবনের মধ্যে যেমন মরণের বাসা তেমনি বন্ধনের মধ্যেও মুক্তির বাসা। কিন্তু সে বাসার পথ মানুষ ততদিনই খুঁজিয়া পায় না, যতদিন না সে কাতর কণ্ঠে বিশ্বেশ্বরকে জগৎপতি

মায়াধীশকে শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিয়া বলে, "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।" ততদিন তাহার নিস্তার নাই—এই কথাই প্রাচীনকালের মহর্ষিগণ বলিয়া গিয়াছেন এবং কি ভাবে এই পথের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা নির্দেশ করিয়াছেন শাস্ত্রসমূহে।

ভারতের ঋষি মহর্ষিগণ জীবকে ব্রহ্মরূপে নিজের আরাধ্য দেবতা বলিয়া মনে করিতেন, তাহাকে দুঃখমুক্তি জন্মান্তররহিত করিবার জন্যই ভারতীয় হিন্দুগণের ধর্মশাস্ত্রে নিজেকে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের কিছুমাত্র ছিল না। অতএব তাঁহাদের হিতোপদেশ সকল শুনিয়া রাখিতে দোষ কি? তাহা যদি শুনিতে হয়, তাহা হইলে 'বুঝি বা না বুঝি' বলিয়া নিত্য গীতাপাঠ করা উচিত। ফলে মানুষের অন্তরে গাঢ় মোহান্ধকারে নিবদ্ধ স্বয়ং ভগবান্ একদিন জাগিয়া উঠিবেন, মিথ্যা আত্মপ্রবঞ্চক মনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বলিবে—

"প্রবুদ্ধোঽস্মি প্রবুদ্ধোঽসি দুষ্টশ্চৌরোঽয়মাত্মন
মনোনাম্ নিহন্ম্যস্মি মনসাস্মি চিরং হৃতঃ।"

যাঁহারা চিন্তাশীল — যাঁহাদের চিন্তা করা স্বভাব, যাঁহারা চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাদিগের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা, অন্ততঃ বাঙ্গালায় অনুবাদ করা মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত একবার পড়িয়া দেখিলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করিব, আমার মরণের পরে লেখা—মরণের পূর্বেই সার্থক হইবে।

———

পটভূমি

মানুষের মৃত্যু বা মরণ নাই,—আছে দেহত্যাগ, যেহেতু— মানুষের দেহের ভিতর আর একটি অতীন্দ্রিয় মানুষ বাস করে— তাহার নাম আত্মা, আত্মার কোন মূর্ত্তি নাই। কিন্তু আত্মা যে দেহের সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করে তাহার মূর্ত্তি আছে। দেহের মধ্যে অবস্থানকালে সেই দেহের মূর্ত্তিই তাহার মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, অতএব আত্মা ও মানুষ অভিন্ন, কিন্তু লোকে আত্মাকে দেখিতে পায় না, তাহার মূর্ত্তি বা দেহকে দেখিতে পায় এবং আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় আত্মার যাহা কিছু ধর্মাধর্ম জ্ঞান কর্ম সে সমস্ত মানুষের বলিয়া নির্দেশ করে। তা ছাড়া আত্মার মনুষ্য দেহের সহিত সংযোগকে মানুষের জন্ম বলা হয়। সেজন্য আত্মার দেহত্যাগকে মানুষের মৃত্যু বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

আত্মা অমর। উপনিষদের মহর্ষি মানুষগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" হে মনুষ্যগণ! তোমাদের তো মৃত্যু নাই, তোমরা অমৃতের সন্তান।

এই অমৃতের সন্তান মানুষ বা আত্মা যখন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন সে কি কি লইয়া যায় সে সম্বন্ধে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

অর্থাৎ যে যেরূপ ভাবনা লইয়া দেহত্যাগ করে মরণের পর তাহারা সেইভাবে ভাবিত হয়। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন—আত্মা

যখন দেহত্যাগ করে তখন সে যে দেহে বাস করিত তাহার মৌলিক পঞ্চবিধ অচেতন উপাদান হইতে পরম সূক্ষ্ম চারিটি উপাদানের দ্বারা একটি অতি সূক্ষ্মদেহ রচিত হয়, তাহার নাম আতিবাহিক দেহ। আত্মা সেই আতিবাহিক দেহের সহিত যুক্ত হইয়া যে দেহে বাস করিত তাহা ত্যাগ করে। যেমন, জলৌকা একটি তৃণকে আশ্রয় করিয়া পূর্বের আশ্রিত তৃণকে ত্যাগ করে, মানুষের দেহস্থিত আত্মা তেমনি সেই আতিবাহিক দেহের সহিত সম্যক্ প্রকারে পরিষ্বক্ত অর্থাৎ তন্ময়ভাবে মিলিত হয় বলিয়া আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তিতে বলা হইয়াছে—"অততি দেহাৎ দেহান্তর গচ্ছতি ইতি গমনার্থং অত্ ধাতোঃ মণিন্ প্রত্যয়াৎ আত্মা", অর্থাৎ আত্মা একটি দেহকে গ্রহণ করিয়া পূর্ব দেহ হইতে চলিয়া যায় বলিয়াই আত্মার নাম আত্মা।

আত্মার সেই আতিবাহিক দেহ এমনই সূক্ষ্ম যে, তাহা সাধারণ লোক দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন যোগী ঋষি, তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইয়া থাকেন।

আত্মার আতিবাহিক সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে ধর্মাধর্ম শুভাশুভ কর্মের ফল, প্রকৃতি প্রবৃত্তি ইচ্ছা দ্বেষ অভিমান আশা আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কামনা প্রভৃতি এবং এই দেহের যত বুদ্ধি অহংকার এবং জ্ঞান ও কর্মের ইন্দ্রিয় সকল অব্যক্তে বা অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, যেমন একটি অব্যক্ত বৃক্ষবীজের মধ্যে পত্র পল্লব পুষ্প ও ফল প্রভৃতি অব্যক্তভাবে অবস্থান করে এবং সেই অব্যক্ত বৃক্ষবীজে অঙ্কুরাদি ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে বীজের মধ্যে যাহা যাহা ছিল সে সমস্তই অভিব্যক্ত হইয়া বৃক্ষে দেখিতে

পাওয়া যায়। সেজন্য আত্মা যখন আতিবাহিক দেহের সহিত যুক্ত হইয়া গর্ভাশয় মধ্যে মনুষ্য দেহধারণ করে এবং গর্ভশয্যা ত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় তখন হইতে সমগ্র জীবনে সেই সকল অভিব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে, যাহার জন্য মানুষে মানুষে কত প্রভেদ—কেহ সাধু, কেহ চোর, কেহ পণ্ডিত, কেহ মুর্খ, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র প্রভৃতি। মানুষের চরিত্র ও প্রবৃত্তির ভেদ তাহার পূর্বকৃত কর্মের ফল। মানুষের পূর্বজন্মের শুভাশুভ প্রবৃত্তি ধর্মাধর্ম এই জন্মে সংস্কাররূপে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

আতিবাহিক দেহ মানুষের মনের প্রকৃতি অনুসারে গঠিত হয়। যেহেতু আত্মা মনের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি অনুসারে মনোবেশে আসিয়া চতুর্বিধ যোনিমধ্যে যেখানে তাহার প্রবৃত্তির উপশম হয় সেইখানে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আতিবাহিক দেহধারণ করিয়া অচিরে পুনরায় দেহধারণের সৌভাগ্যও সকলের হয় না, সেজন্য তাহারা বায়ুভূত নিরাশ্রয় হইয়া অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অবস্থারই নাম প্রেত অবস্থা, ইহাদিগকে লোকে ভূত বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকে। সেই বিদেহী আত্মা বা ভূতপ্রেতগণের সন্তানগণ ধর্মপরায়ণ সৎপ্রকৃতির হইলে অথবা গয়াধামে বিষ্ণু-পাদপদ্মে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে তাঁহাদের যাতনাময় প্রেতযোনি হইতে মুক্তি ঘটে, পুনরায় ইহলোকে আসিয়া পুণ্য কর্মের দ্বারা আর যাহাতে মরণের পর দুঃখময় অবস্থায় পতিত হইতে না হয়, সেজন্য চেষ্টা করে।

এই নিবন্ধ লিখিত বক্তব্যের প্রমাণ মহর্ষি চরক প্রণীত সংহিতাগ্রন্থে—শারীর স্থানে এবং আচার্য গঙ্গাধর কৃত চরকসংহিতার

টীকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করা হইতেছে। যথা—

ভূতৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতঃ সুসূক্ষ্মৈর্মনোজবো দেহমুপৈতি দেহাৎ।
কর্মাত্মকত্বান্ন তু তস্য দৃশ্যং দিব্যং বিনা দর্শনমস্তি রূপম্ ॥৩০॥
অতীন্দ্রিয়ৈস্তৈরতিসূক্ষ্মরূপৈরাত্মা কদাচিন্ন বিযুক্তরূপঃ।
ন কর্মণা নৈব মনোমতিভ্যাং ন চাপ্যহঙ্কারবিকারদোষৈঃ ॥৩৬॥
রজস্তমভ্যাস্ত মনোঽনুবদ্ধং জ্ঞানং বিনা তত্র হি সর্বদোষাঃ।
গতিপ্রবৃত্ত্যোস্তু নিমিত্তমুক্তং মনঃ সদোষং বলবচ্চ কর্ম ॥৩৭॥

ভাবার্থ এই যে—আত্মা কখনও সেই অতীন্দ্রিয় রূপ হইতে বিযুক্ত হয় না। আর কৃতকর্মের ফল মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার অর্থাৎ সে সেই জীবনে যে সকল কর্ম করিয়াছিল সেই সকল কর্মের কর্ত্তৃত্বের অভিমান হইতে যে সকল দোষের সৃষ্টি হয় তাহা হইতেও মুক্ত হয় না। দোষযুক্ত মন এবং বলবান কর্ম তাহার গতি ও প্রবৃত্তির হেতু।

প্রাচীনকালে শরীর ও মনের সহিত যুক্ত আত্মা বা মানুষের শরীর ও মন হইতে দুঃখ প্রতিকারের নিমিত্ত আয়ুর্বেদ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আয়ুর্বেদের শারীর চিকিৎসা মাত্র গ্রহণ করিয়া সব কিছু উপেক্ষিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন—তাঁহাদের একবার আয়ুর্বেদ দর্শন পাঠ করা উচিত বলিয়া মনে হয়—কেননা আত্মার এরূপ প্রত্যক্ষ পরিচয় আয়ুর্বেদ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। এইজন্য পূর্বে সকল দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত। কিন্তু, 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।'

মরণের পর আর যে কিছু আছে একথা লোকে স্বীকার করে না। এইরূপ লোক যে কেবল বর্ত্তমানে দেখা যায়, তাহা নহে। অতি প্রাচীনকালেও এরূপ লোকের অভাব ছিল না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আর কিছু নাই, যাহা দেখিতেছি ইহাই সব—এইরূপ ধারণার হেতু—প্রত্যক্ষকে একমাত্র জ্ঞানের উপায় বলিয়া স্বীকার করা। কিন্তু প্রত্যক্ষের পরপারে আরও কত কি আছে, তাহা আজকাল লোকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়; কেননা সাধারণের প্রত্যক্ষের বাহিরে অপ্রত্যক্ষ দেশ হইতে যাহারা ঘুরিয়া আসিয়াছে এরূপ লোকের বর্ত্তমানে অভাব নাই এবং তাহাদের কথা যে প্রামাণ্য তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ইহাদিগের কথাকেই আপ্তবাক্য বলে। প্রাচীনকালের লোকেরাও আপ্তবাক্যের যথেষ্ট সমাদর করিত।

মানুষের ইহকাল প্রত্যক্ষ, পরকাল অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ পরকালের কথা যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী ঋষি মহর্ষি ছিলেন। তাঁহারা কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। সেজন্য তাঁহাদের কথা যাহারা শুনিত তাহাদিগকে বলা হইত আস্তিক, আর যাহারা তাহা শুনিত না মানিত না বিশ্বাস করিত না তাহাদিগকে বলা হইত নাস্তিক। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের কথাই আপ্তবাক্য। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষদৃষ্ট জড়জগতে তত্ত্ব সকলের দ্রষ্টা, অপ্রত্যক্ষ পরলোক সম্বন্ধে তাঁহারা অন্ধ। অতএব 'অন্ধেন নীয়মানা যথা অন্ধাঃ' অর্থাৎ অন্ধ যদি অন্ধকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলে, তাহা হইলে যেমন হয়, তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ-

গণের উপাসকগণ যদি পরলোকের তত্ত্বসকল অসত্য বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা বিচিত্র নহে।

প্রাচীনকালের ঋষিমহর্ষিগণ পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—মানুষ মরিয়া পরলোকে যায় এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার প্রমাণ—মানুষ যখন নিদ্রিত হয় তখন সে কিছুই করে না, কিন্তু এই নিদ্রিত ব্যক্তি যখন আবার জাগিয়া উঠে তখন সে সব কিছু করে। এইরূপ মানুষের মৃত্যুও নিদ্রার মত—তারপর তাহার যে পুনর্জন্ম তাহা জাগরণের মত। যদি মানুষের মৃত্যুই শেষ পরিণতি হইত তাহা হইলে মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি কর্ম দেখা যায় তাহা কখনও সম্ভব হইত না, যেমন দেখা যায়—মানুষের মধ্যে কাহারও জীবন সুখময় কাহারও দুঃখময়; একই বাপমায়ের সন্তান — কেহ সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন পরোপকারপরায়ণ, কেহ তেমনি অসৎপ্রকৃতিযুক্ত পরের অপকার ছাড়া কিছু করে না—এমনকি সহোদর ভাই বোনের মধ্যে হিংসা দ্বেষ রাগ রোষ কলহের অন্ত নাই। শুধু তাহাই নহে, আকৃতি দেহের বর্ণের মধ্যেও কত পার্থক্য। কেহ যেমন পণ্ডিত, অপরে তেমনি মূর্খ। এইরূপ ভাগ্যের মধ্যে কর্মের মধ্যেও কত পার্থক্য। কেন এমন হয়? অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ইহারা পূর্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম করিয়াছিল, সেইরূপ কর্মের ফল ইহজন্মে ভোগ করিতেছে। তদ্ভিন্ন—সদ্যোজাত শিশুর রোদন, স্তন্যপান, হাস্য—আরও কত কি—যে সকল সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়, সবই পূর্বজন্মের সংস্কার। আরও দেখা যায়, কেহ কেহ পূর্বজন্মের অনেক কথাই ইহজন্মে বলিতে পারে, এমনকি পূর্ব-

জন্মের বাপ মা বাড়ীঘর প্রভৃতিরও সংবাদ দিতে পারে। আমি দেখিয়াছি আমাদের বাড়ীতে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে পূর্বজন্মে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দলে ছিল। বর্মায় যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল সে সমস্তই বালকটি প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার মত বলিত। এখন কিন্তু সে অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া সে সব বিস্মৃত হইয়াছে, অধিকন্তু পাঠ্যপুস্তক সমূহের প্রভাবে ভারবাহী শিশুগর্দভের মত জাতিবিস্মর বালকরূপে বিরাজ করিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে এইরূপ বহু বিষয়ের পর্যালোচনা করা হইয়াছে। সে সকল জন্মান্তরবাদ স্বীকার না করিলে সমাধান করা যায় না। মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—অতএবানুমীয়তে যত্তৎ স্বকৃতমপরিহার্য্যমবিনাশিপৌর্বদেহিকং দেব-সংজ্ঞকং আনুবন্ধিকং কর্ম। তস্য এতৎ ফলম্, এতস্য ইতশ্চ অন্যৎ ভবিষ্যতীতি—যথা ফলাদ্বীজং অনুমীয়তে ফলঞ্চ বীজাৎ। অর্থাৎ ফল হইতে যেমন বীজ এবং বীজের অনুরূপ বৃক্ষ ও ফুল ফল প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, তেমনি মানুষ পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল কর্ম করে, সে সকলের ফল মানুষের মন বা মনোময় সূক্ষ্ম দেহের সহিত গাঁথা থাকে, তাহারই জন্য মানুষের পরজন্মে সেই সকল কর্মের বিচিত্র ফল ইহজন্মে অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যায়—যাহার অন্যথা হয় না, ইহারই নাম দৈব। এই জন্যই মানুষে মানুষে কত বৈশিষ্ট্য কত ভেদ।

দুঃখের বিষয় মানুষের এখন ধারণা, বর্ত্তমানে দৈব বা প্রাক্তন বলিয়া কিছু নাই। কর্মফলও আর পরজন্মে ভোগ করিতে হয় না, যেহেতু পরজন্ম বলিয়া কিছু নাই। তা ছাড়া যদিও বা কিছু থাকে তাহা হইলে ইহজন্মের কৃত কর্মের ফল ইহজন্মেই কিছু ভোগ করিয়া

কিছু ফাঁকি দিয়া কাটিয়া যাইবে, দেহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সে সব কিছু লইয়া যাইবে কি ? মৃত্যুর পরে ব্যাঙ্কের টাকা, বাড়ী, ঘর, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু এখানেই পড়িয়া থাকে—তখন অদৃশ্য অবিশ্বাস্য কর্মফল যে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে চলিয়া যাইবে এ কথা তো কোন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলিয়া যান নাই। সব কিছু কুসংস্কার।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে মানুষ জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করিবে, কিন্তু ইহা মানুষ-বানরের ক্রমোন্নতির ফল। কালক্রমে বানর মনুষ্যাকৃতি ধারণ করিলে ও তাহার লাঙ্গুলের সঙ্গে 'বা' শব্দের বিলোপ ঘটায় নর হইয়াছে। এইজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে গিয়া কঙ্কাবতীর লেখক স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা মনে পড়ে—মশক-পত্নী হস্তী-যুবককে প্রীতিভরে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল — "হাতী ঠাকুর গো", কেননা আদিম শুণ্ডধারী চতুষ্পদ জীব মশকেরই ক্রমবিকাশের ফলে মদমত্ত বিপুলকায় হস্তিবরের আবির্ভাব।

লোকে বলে — 'কাঙ্গালের সোনা বিকোয় না।' এখন ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন যে প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত না হইবারই কথা! কিন্তু সংবাদপত্রের সংবাদে জানা যায়—খৃষ্ট-জন্মের বহু লক্ষ বৎসর পূর্বের মানুষের অস্থি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মানুষের মৃত্যু অনিবার্য হইলেও এমন সব সাধু মহাপুরুষ বা দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের কৃপায় মানুষ নিশ্চিত মৃত্যু হইতেও রক্ষা পাইয়া থাকে। ইহা বোধ হয় কেহ কেহ

ভাগ্যক্রমে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমানে অবিশ্বাসী মনুষ্যগণ তাহা বিশ্বাস করেন না।

মৃত্যু সাধারণতঃ দুই প্রকার। কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যু। বয়ঃপরিমাণে স্বাভাবিকভাবে যে মৃত্যু তাহা কালমৃত্যু। এতদ্ভিন্ন সবই অকাল-মৃত্যু। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—

একোত্তরং মৃত্যুশতং অথর্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংজ্ঞঃ স্যাৎ শেষাস্ত্বনন্তরঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ অথর্ববেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, এক শত একটি মৃত্যুর মধ্যে একটি মাত্র মৃত্যুকে কাল-মৃত্যু বলা যায়, অবশিষ্ট সব অকাল-মৃত্যু। ইহাই যদি স্বয়ং ধন্বন্তরীর যুগে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে যত কিছু মৃত্যু সবই অকালমৃত্যু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেননা, এখন আর মানুষ আগেকার কালের মত প্রায়ই বাঁচে না। স্বাভাবিক মৃত্যুকালের পূর্বেই প্রায় দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। যেহেতু, যদিও বিজ্ঞানপ্রভাবে মানুষের জীবন রক্ষার বিবিধ উপায় এবং ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদিও সে সকলের যথাযথ প্রয়োগের অপব্যবহারে মানুষের জীবনের পরিবর্ত্তে মরণকেই বরণ করিতে হয়, তথাপি বিজ্ঞানের কৃপায় মাঠে ঘাটে, আকাশে বাতাসে এত প্রকার মৃত্যুর উপায় সহজ ও সুলভ হইয়াছে যে তাহাতে আর মানুষকে কাল-মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না, অকালেই কালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া প্রাচীন কবি কালিদাসের কথা মনে হয়—

"প্রকৃতির্মাহ মরণং মনুষ্যাণাং বিকৃতির্জীবনমুচ্যতে।"

অর্থাৎ মানুষের মরণই স্বাভাবিক—বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্যের বিষয়।

মরণের পর মানুষকে আবার জন্মগ্রহণ করিতেই হয়, তাহার অন্যথা হয় না। কিন্তু সে যে আবার মানুষই হইবে, যে বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া গিয়াছে আবার সেইখানেই আসিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। আসিতে পারে, নাও আসিতে পারে। কতদিন পরে আসিবে তাহাও বলা যায় না। কেননা, মরণের পর পরলোকেও ইহকৃত কর্মের ফল, ভাল বা মন্দ, তাহা মানুষকে ভোগ করিতেই হয়। কিন্তু সেই ভোগের পরিসমাপ্তি কত দিনে হয় তাহা জানা যায় না। তারপর তাহাকে পরলোক হইতে তৎকালীন প্রবৃত্তিবশে মনোবেশে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আর যদি তাহার সৎকর্ম থাকে, তাহা হইলে তাহার এই সুখদুঃখময় হাসিকান্নার রাজ্যে না আসিয়া লোকান্তর হইতে উর্দ্ধতম লোকে যাইতে হয়। সেখানেও তাহার উত্থানপতন আছে, তাহার লৌকিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় প্রমাণ—প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে সে বিষয়ে কাহাকেও চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। এখন লোকে ইহজন্মে কোন গ্রহের ফলে কি প্রকার সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে সেইটুকু মাত্র দেখে—তাহাও সকলে নয়।

মরণের পর যাহারা এখানে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, শাস্ত্র বলেন, তাহারা ভোগ প্রবৃত্তি বা বাসনা কামনার বশে এই জগতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রস্তর প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াও অন্তর্নিহিত কর্মফলরূপ ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি করিয়া থাকে। সে জন্য ইহসংসারে এবং ইহজগতে তাহাদের যে যোনি বা জন্মস্থান আছে তাহা চারিভাগে বিভক্ত। রাজর্ষি সুশ্রুত বলেন, তাহারা—

তির্যগযোনি-মানুষদেবেষু সঞ্চরন্তি ধর্মাধর্মনিমিত্তম্। আমি একজন সাধুমহাপুরুষের নিকট শুনিয়াছিলাম, গয়াধামে কয়েকজন প্রস্তর-দেহধারী মনুষ্য তাঁহার কৃপায় প্রস্তরদেহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। রামায়ণ গ্রন্থেও দেখা যায়, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-কমল স্পর্শে অহল্যার পাষাণদেহ হইতে মুক্তি ঘটিয়াছিল।

মহর্ষি আত্রেয়ও বলেন,—মানুষের ভোগ্য বিচিত্র। সেই সকল ভোগ্য চারি ভাগে বিভক্ত দেহসকল ধারণ করিয়া ভোগ করিতে হয়। তাহার মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য। সেজন্য কেহ নিরামিষ কেহ আমিষ ভোজন করিবার জন্য তাদৃশ দেহ ধারণ করে।

এমনকি পূতি, পর্যুষিত, অমেধ্য প্রভৃতি ভোজন জন্য তদনুরূপ কতপ্রকার দেহ আছে। একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, বিবিধ মেধ্য ও অমেধ্য ভোজনের হেতু কি। হেতু একমাত্র তাহার আন্তর প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিই ভোজ্য-দ্রব্যের বিবিধ বৈচিত্র্যের হেতু। আশ্চর্যের বিষয় জীবমাত্রের মধ্যে যে বিবিধ প্রকার ভোজ্যের প্রবৃত্তি তাহার নিবৃত্তির জন্য দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় বুদ্ধিরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের জন্য বাড়ীতে পচা কাঁঠাল বা তাল আনিলে এমন সব মাছি আসিয়া হাজির হয়, যাহাদিগকে সাধারণতঃ বাড়ীর মধ্যে দেখা যাইত না। মনে হয় যেন তাহারা নিমন্ত্রিত। এই নিমন্ত্রণ গৃহস্থ করে না, করে তাহাদের আন্তর ভোগপ্রবৃত্তি। তাহারাই তাহাদিগকে ডাকিয়া আনে। মানুষেরও মনে ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই অসাধারণী বৃত্তি দেখা যায়। তাহার প্রমাণ আমি একটা জানি। আমাদের বাড়ীতে 'এলেনবেরী' হইতে একজন মিস্ত্রী মোটর মেরামত করিতে আসিত।

আসিয়াই বলিত—"সরিয়ে ফেলুন, শীঘ্র সরান, পাকা কলা নিশ্চয়ই আছে, নতুবা আমার বমি আসিবে কেন?"

একই মানুষের মধ্যে এত রুচিবৈচিত্র্যের হেতু কি? কেন একজন যাহা সমাদরে গ্রহণ করে, তাহাই আবার আরেকজন অবজ্ঞাভরে ত্যাগ করে। সেই জন্য শাস্ত্রে দেখা যায় মানুষের প্রকৃতিভেদে খাদ্য ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। খাদ্যের এই ত্রিবিধ ভেদের একমাত্র হেতু, মানুষের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য। কেহ মিষ্টি, কেহ ঝাল, কেহ লবণ, কেহ আমিষ, কেহ ফলমূল ভালবাসে। তাহার হেতু মানুষের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য। এমন কি মানুষের যে এত ভোগ্য ও পোষাকপরিচ্ছদের বৈচিত্র্য, এ সকলের মূলেও মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মানুষ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহা ত্যাগ করা যায় না। মরণে দেহত্যাগ করিলেও মানুষ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে পারে না। সেজন্য প্রাচীনকালে লোকে বলিত—

সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা পুমাংস সমভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি।

অর্থাৎ, সতী স্ত্রী আর অত্যাজ্যা প্রকৃতি মানুষের সঙ্গছাড়া হয় না। এই জন্য সাধুপ্রকৃতির সদাচারসম্পন্ন পুরুষগণ মরণের পরেও আবার যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহারা তাদৃশ সদাচারসম্পন্ন পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করেন। একবার একটি সাধুপুরুষ আমায় বলিয়াছিলেন,—আমার আশ্রমে একটি কুকুর ছিল। সে কখনও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ছাড়া ভোজন করিত না। মরণও তাহার অপূর্ব। একদিন সন্ধ্যাকালে যখন সংকীর্ত্তন হইতেছিল তখন সে পূর্বদিনের মত

তাহার সহজ শব্দ করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত। মুহুর্মুহু হরিনামে তাহার অন্তিম কৃত্য সমাধা করা হইল। বোধহয় এরূপ ঘটনা অনেকেই জানেন।

সাধারণ লোকে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ জানে না। তাই অমৃতের সন্তান আত্মরূপে পরিচিত মানুষকে দেহত্যাগ করিতে দেখিয়া বলে মানুষের মৃত্যু হইয়াছে,—সে যেমন এখানে নাই, তেমনি আর কোথাও নাই। মানুষের এই ভ্রান্তি,—বিনশ্বর দেহের মধ্যে অবস্থিত আত্মার স্বরূপকে না জানিয়া দেহের নাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হইয়াছে মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হওয়া বোধহয় অনাদি-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যসহচর বাল্যবন্ধু অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু সম্ভাবনায় শোকবিমুক্ত করিবার জন্য গীতা রচনা করিতে হইয়াছিল। সেই গীতা এখনও অনেকে পাঠ করেন, কিন্তু মরণের জন্য শোক করিতে বাহ্যতঃ না হইলেও অন্তরে অনুভব করিতে তো কাহাকেও কম দেখা যায় না।

মরণের পরে শোক না করিবার জন্য হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রকারগণের তো উপদেশের অন্ত ছিল না। এই জন্যই লোকে বলিত—"ন হি যুক্তিশতেন ঘটং পটয়িতুং শক্যতে", শত শত যুক্তি দিয়াও ঘটকে পট করা যায় না। তাহার আরও প্রমাণ—মহর্ষি বেদব্যাস, যিনি মায়াবাদের আবিষ্কর্ত্তা, অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, তিনি দিব্যজ্ঞানী পুত্র শুকদেবকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়াছিলেন; ইহা দেখিয়া বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষী পর্যন্ত অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই। ভগবান

বেদব্যাস কি জানিতেন না এই শোক মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র? এইজন্য মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সপ্তশতী চণ্ডীতে—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

অতি বড় বড় যে সকল জ্ঞানী পুরুষ, তাঁহাদেরও চিত্তকে যিনি টানিয়া মোহগর্ত্তে নিপাতিত করেন — মহাজ্ঞানী বেদব্যাসকেও চোখের জলে আকুল করিয়া "হা পুত্র, হা পুত্র" বলিয়া ধাবিত করিয়াছিলেন, তিনি কি যে সে? তিনি মায়ের মা, মহামায়া। একথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও জানিতেন। তাই তিনি সৃষ্টিকালে যোগমায়াকে লইয়া সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তবে তিনি আশ্রিত ভক্তগণকে আশ্বস্ত ভক্তগণকে বলিয়া গিয়াছেন—মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং তরন্তি তে। ভয় কি? আমি তো আছি। তাই এখনও দেখা যায় শোকাকুল মানবচিত্ত শ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

মরণের একটি অপূর্ব সাফল্য আছে। যদিও মরণের দুঃখ যে মরিয়া লোকান্তরে যায় এবং আত্মীয়েরা তাহার অভাবে শোক-গ্রস্ত হইয়া ইহলোকে ভোগ করে,—তথাপি উভয়ত্র গত ব্যক্তি ও এখানে অবস্থিত আত্মীয়স্বজনের চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে—ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্থিরচিত্তে বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন, অনুভবও করিবেন। এ সম্বন্ধে আমি দুইটী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জানি। একজন বলিলেন—এখানে থাকিলে যে একটা টাকা রোজগারের ফল হইত, আর এখন যেখানে গিয়াছে, সেখানে ঠাকুর তাহাকে কি করিবেন

তাহা আমি জানি না, বুঝিতে পারি? আমি তাহাকে এখানে বড়জোর একটা শ্রেষ্ঠ সংসারী মানুষ করিতাম, আর সেখানে তাহাকে ঠাকুর একটা অতিমানুষ করিয়া পাঠাইবেন, যাহাতে তাহার দ্বারা এই জগতে কত লোক কত প্রকারে উপকৃত হইয়া জীবন ধন্য বলিয়া মনে করিবে। আর একজন অতি পণ্ডিত পরম ভাগবত তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষিত সম্মানিত প্রভূত উপার্জনশীল পুত্রের অকালে অনুচিত অন্যায়ভাবে দেহত্যাগের পর আমায় এক অপূর্বভাবে বলিলেন—"ও কথা তুলবেন না, ঠাকুর আমায় পরীক্ষা করবার জন্য এই অঘটন ঘটাইয়াছেন কি না বলতে পারেন?" বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, এই অসামান্য ভাগবত মহাপুরুষ আমার নিকট অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন অনেক কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল, কিন্তু আমি কোনপ্রকারে বুঝিতে পারি নাই, ইঁহার উপযুক্ত পুত্র লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে ছাত্রাবস্থায় যেমন সদাপ্রসন্ন দেখিতাম, এখনও তাঁহাকে তদনুরূপ নহে—অধিকতর সুপ্রসন্নচিত্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, জীবন ধন্য মনে হইল,—ইনি যেন গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। মরণের পরে যাহারা শোকাতুর হইয়া অতীতের স্মৃতিকে সম্বল করিয়া জীবনযাপন করে, তাহা দেখিয়া করুণাময় শ্রীভগবানের কোন কার্যের সমালোচনা করা মহাপাপ বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালার কবি রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন—

"মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান"।

তাহা কেন, কি উদ্দেশ্যে কেহ বলিতে পারে? লোকে অবশ্য বেদের ব্যাখ্যার মত অনেক ব্যাখ্যাই করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্তরের

অনুভূত বেদনার অনুভূতি কেহ কি বলিতে পারে? সাধারণ অশিক্ষিত পল্লীবাসী জনগণের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়—"পরিচিত অন্ধকার"। অন্ধকারে বস্তুর স্বরূপ দর্শন কি সম্ভবপর? এই মৃত্যুকে দেখিয়াই মহর্ষি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সপ্তশতীতে বলিয়াছেন—"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি"। —মা, তুমিই সত্যই বরদায়িনী, জগজ্জননী। তোমার দেওয়া মরণেও কত কৃপা, কিন্তু বাহিরের দৃশ্য অতি নিষ্ঠুর।

আমি এই মরণের পরে লিখিতে বসিয়া যে সকল যাতনাময় জীবনযাপনকারী ভূতপ্রেতের অবস্থা জানিতে পারিয়াছি, তাহা কি চিরদিন এমনই ভাবে থাকিবে, এ কথা কোন আস্তিক ভক্ত হিন্দু বলিতে পারেন? আমারই জীবনে এক অনুভূত আনন্দের আস্বাদ একজন যাতনামুক্ত বিদেহী আত্মা—গয়ায় পিণ্ডদানের পর দিয়াছিলেন, এ কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি। মহর্ষি অগ্নিবেশ প্রণীত সংহিতা পড়িয়া জানা যায়—বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর জরা বা বার্দ্ধক্য—এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া কেহ কি বলিতে পারেন—বার্দ্ধক্যই যদি মানুষের প্রয়োজন, তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপায় একেবারে বার্দ্ধক্য না আসিয়া বাল্যাদিক্রমে আসে কেন? বালক যদি এম্-এ পড়িবার পাঠ্যপুস্তক পড়িবে তবে তাহাকে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়াইবার সার্থকতা কি? কবি কালিদাস বলিয়াছেন,—'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ'। বিজ্ঞতম হইতে গেলে যেমন ক্রমের প্রয়োজন, তেমনি মানুষের বাসনা কামনা দ্বারা চিরনিবদ্ধ সাধারণ জীবনের ভগবচ্চরণে চিরবিশ্রামের জন্য মরণের পর মরণের আবশ্যক, তাহা কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখে?

প্রত্যক্ষদর্শী আপাত সুখসৌভাগ্যে মত্তচিত্ত মানুষের মৃত্যুর জন্য শোক-কাতর দেখিয়া শ্রীভগবানের আদেশে বিশ্বপ্রকৃতির এই অপার করুণাপ্রবাহের সমালোচনা করা কি উচিত? গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে স্বয়ং বলিয়াছেন, বাল্য যৌবন জরার মত মৃত্যুও জীবগণের অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু হইলে স্বর্গ, বাঁচিয়া থাকিলে জাগতিক সুখসম্ভোগ, এইরূপ মনোভাব লইয়া কোন মানুষ কি জীবনযাপন করে? মানুষ কেবল নিজের সুখ সুবিধার দিকে নজর দিয়া মহাবিজ্ঞের মত সব কিছুর বিচার করে। আমি এই মরণের পরে মানুষের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা জানিবার জন্য বর্ত্তমানে অনেক কেতাব পড়িলাম, এদেশীয় শিক্ষিত জনগণের উদ্ধৃত বিদেশীয় পণ্ডিতগণেরও মতবাদ দেখিলাম, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগণ মৃত্যুকে যেভাবে দেখিয়াছেন এবং তাহার ফলস্বরূপ যে সকল বিধি-বিধানের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কি মৃত, কি জীবিত—উভয়বিধ জনগণের শোকাকুল চিত্ত শান্তিলাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরের আচার্য শ্রীসুদর্শন স্বামীজী মহারাজ আমায় বলিয়াছিলেন, 'নবপরিণীত যুবক যেমন শ্বশুরবাড়ীর পত্রের প্রতীক্ষায় থাকে, তেমনি আমি মরণের প্রতীক্ষায় আছি।' একই বস্তুর ক্ষেত্র-পাত্রানুসারে কিরূপ মূর্ত্তির প্রকাশ কেহ ভাবিয়া দেখে কি? মরণ সাধারণ মানুষের পক্ষে যেমন, তেমনি অসাধারণ মানুষের পক্ষে নহে, তাহা আমি দুইজন সাধু মহাপুরুষের বাক্য শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

এইজন্য বলিতে ইচ্ছা হয়—যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য চিত্তকে প্রস্তুত রাখা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানের নব

স্বাধীনতা প্রাপ্ত জনগণের মধ্যে অনেকেই বিদেশীয় ভাবের ভাবুক। তাহাদের মতে—

"হেসে নাও ছ'দিন বই তো নয়।
কে জানে কার কখন সন্ধ্যা হয়॥"

যাহাদের চিত্ত যাযাবর, তাহারা কি কখন ঘর বাঁধিয়া সংসার করে? "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—এই চিত্তবৃত্তির পরিপ্লাবনে আজ ভারতের হিন্দুগণ তৃণ-কাষ্ঠের মত নিরুদ্দেশ পরিণামের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা কি কেহ দেখে বা চিন্তা করে? তাহা করিতে হইলে সংযমের একান্ত আবশ্যক—ধর্মনিষ্ঠ আচারনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। তাহা কি হইবে? হইতে হইলে ভারতের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রচলনের আবশ্যক —যাহা বর্ত্তমানে ভারতে একান্ত অবহেলিত। মানুষ মানুষই। সকলেই মানবজাতির অন্তর্গত, ইহার মধ্যে তারতম্য কুসংস্কার।

মানুষ যে সংযম শিক্ষা জীবিত অবস্থায় গ্রহণ করিতে চায় না, সেই সংযমই মরণের পর যমরাজের কাছে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়, ইহা আমি একজন প্রচ্ছন্ন যোগী, সাধু গৃহস্থ মহাপুরুষের নিকট শুনিয়াছিলাম। মানুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের শিক্ষাদাতা যেমন রোগ, তেমনি মানুষের সর্বপ্রকার অধর্ম অনাচারের নিবারণ-কর্ত্তা, প্রকৃত মনুষ্যধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যম। এইজন্য হিন্দুগণ যমকে ধর্মরাজ বলিয়া থাকেন। ধর্মরাজই পরলোকে মানুষকে পরিশুদ্ধ করিয়া তাহাদের কর্মানুসারে অধোলোকে ও উর্দ্ধলোকে প্রেরণ করেন। উর্দ্ধ ধর্মরাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা মানুষের নাই, সেইজন্য

মরণের পরে লোককে পরলোকে কাটাইতে হয়। এই পরলোকে বহু স্তর আছে। সর্বত্র পরিশুদ্ধ হইতে হইতে পরমপদ প্রাপ্ত হয়—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। যাঁহারা যাঁহারা সাধু, পরহিতব্রতী, তাঁহারা তাঁহারা মরণের পরে আতিবাহিক দেহ ধারণ না করিয়াই শ্রীগুরুর কৃপায় যোগমার্গে একেবারে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া—"অবিদ্যায়াঃ পরে পারে বিদ্যোদ্-ভাসিতবিগ্রহং পরং জ্যোতির্ময়ং দেবং নারায়ণমহং ভজে" বলিয়া পরমপদ ভোগ করেন।

ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায়, খাদ্যবস্তুর সারভূত পদার্থ—রস-রক্তাদি ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হইতে হইতে চরম দেহধাতুতে পরিণত হয়। আহারের খাদ্য রসরক্তাদি ক্রমে পরিণত করিবার জন্যে প্রতি ধাতুতেই একটি অগ্নিময় পদার্থ আছে, যাহা পূর্ববর্ত্তী রসকে পাক করিয়া পরবর্ত্তী রসে পরিণত করে, তাহার নাম ধাত্বগ্নি। তেমনি লোকান্তরগত মানুষের রজঃ ও তম গুণের দ্বারা অবিশুদ্ধ চিত্তকে ঊর্দ্ধলোকগামী চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সমন্বিত করিয়া থাকে, ইহাই যমরাজ বা ধর্মরাজের কার্য, ইহা ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানী ও যোগিগণ স্বীকার করেন।

প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণও অগ্নিকে ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যাইবার পুরোহিত বলিয়া জানিতেন। এইজন্য বলিতেন — 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' প্রভৃতি। এইজন্যই তাঁহারা মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেজন্য মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নিকালে যে সকল বৈদিক মন্ত্র দেখা যায়, তাহা অতি অপূর্ব। এরূপ কারুণ্যপূর্ণ মন্ত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে হিন্দুগণ ইহা অনাবশ্যক বোধ করিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অগ্নিতে

সে দেহ দাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। জানিনা তাদৃশ অগ্নিতে দেহকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া অবিনশ্বর বিদেহী আত্মা ইংলণ্ড আমেরিকা বা জার্মাণ প্রভৃতি দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া পরম আনন্দে মোদমান আছেন কিনা। আর ইহাও জানি না, তাদৃশ সৎকারপন্থী অমুসলমান জনগণের চিত্তের শোকানলই বা কি প্রকারে শান্তিলাভ করিতেছে। গীতায় আছে—"যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তৎ এবেতরঃ জনঃ"। বোধ হয় অচিরে এই প্রথা স্বাধীন ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবে। যজ্ঞাদিতে হোমকার্যে ঘৃতাদির অপচয় নিবারণের মত দাহকার্যে কাষ্ঠের অপব্যয় নিবারণ রাজধর্ম।

ভক্তের প্রার্থনায় বলা হইয়াছে—

"অবৈমি তে নাথ পরাং দয়াং তদা
যদৈব মে আত্মহিতেক্ষণে রুচির্ভবেৎ"।

অর্থাৎ হে ভগবান্! তখনই তোমার পরম দয়া বুঝিতে পারি, যখনই আমার নিজের হিত কাম্যে রুচি বা প্রবৃত্তি হয়। প্রাচীন ভারতীয় ভক্তের এই রুচি, এই প্রবৃত্তি আবার কি ফিরিয়া আসিবে?

মরণের পরে মানুষের কি অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকখানি বাঙ্গালা পরলোক-বিষয়ক পুস্তক পড়িয়া দেখিলাম। গ্রন্থকারগণ সকলেই আস্তিক ও বিশ্বস্ত। তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে অনেক পাশ্চাত্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক মহোদয়গণেরও অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারাও বিবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কেহ পুনর্জন্ম বা পরলোকে অবস্থিত দুর্গত বিদেহী আত্মা সকলের দুঃখ নিবারণ বা মুক্তির উপায় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হইল না।

পরন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা ধর্মশাস্ত্র সেই সকল দুর্গত বিবিধ যাতনায় পরিক্লিষ্ট বিদেহী আত্মা সকলের সকল দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া কিভাবে পরম আনন্দময় অবস্থায় উপনীত হয় তাহার বিবিধ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। সে সকল মানিয়া বিশ্বাস করিলে, মানুষ-মাত্রকেই হিন্দুর আচার ব্যবহার সকল অবশ্যই মানিতে হয়। আমি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে, সাহেবদিগের মধ্যে এমন সব অধ্যাত্মবিজ্ঞানী আছেন,—যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুগণের মতই নিরামিষাশী সংযতচরিত্র সদাচারসম্পন্ন। অবশ্য বর্ত্তমানকালের হিন্দুগণ অধিকাংশই সম্পূর্ণ সাহেবী ভাবাপন্ন হইয়া অকপটে হিন্দু বা অমুসলমান বলিয়া লিখিয়া থাকেন।

এখানে একটি কথা বক্তব্য। অনেকেই বলেন—আহার বা খাদ্যাখাদ্য বিচারের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি। তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়, হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে বলে—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" "সত্ত্বং মনঃ"—যে মন মানুষের দেহত্যাগের পর পরলোক গিয়া তাহার সুখ দুঃখের কারণ হয়। আহারের শুদ্ধি বা পবিত্রতার দ্বারা সত্ত্ব বা মনের পবিত্রতা জন্মে। তাহার কারণ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়—মহর্ষি গৌতম, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন—মথ্যমানস্য দধ্নঃ অণিমা উর্দ্ধং সমুদীষতি তৎ সর্পির্ভবতি। এবমেব সৌম্য অশ্যমানস্য অন্নস্য যোঽণিমা উর্দ্ধং সমুদীষতি, তৎ মনো ভবতি। অর্থাৎ দধিকে মন্থন করিলে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ উর্দ্ধে উত্থিত হয় তাহাই নবনীত বা সর্পি। এইরূপ মানুষ যে অন্ন ভোজন করে পরিপাকান্তে তাহা হইতে উত্থিত যে সারতম পদার্থ তাহাই সত্ত্ব বা মন। অপর একজন

মহর্ষি আত্রেয় বলিতেছেন—"সত্ত্বং মনঃ। যজ্জীবস্পৃকং শরীরেণাভিসম্বরাতি।" অর্থাৎ সত্ত্ব বা মন জীবকে, যে জীব মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে পরলোকে লইয়া যায় কেননা—

অতীন্দ্রিয়ৈস্তৈরতিসূক্ষ্মরূপৈঃ।
আত্মা কদাচিৎ ন বিযুক্তরূপঃ।
ন কর্মণা নৈব মনোমতিভ্যাম্।

অর্থাৎ আত্মা বা মানুষ যখন মরণের পর অতি সূক্ষ্ম আতিরাহিক দেহের সহিত যুক্ত থাকে, তখন তাহার সহিত মন এবং বুদ্ধিও থাকে। সেইজন্য যাহারা সদাচারী নিরামিষাশী তাহাদের এবং যাহারা অমেধ্যভোজী আমিষাশী তাহাদের গতি বা পরলোকে স্থান ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

পবিত্র আহার প্রভৃতি দ্বারা মনও পবিত্র হয়—ইহা প্রাচীন ভারতের হিন্দুমাত্রে জানিতেন এবং এখনও যাহারা প্রকৃত হিন্দু তাহারা বিশেষ ভাবেই জানেন। এই পবিত্র নিরামিষ আহার প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্মল, তাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি নামে পরিচিত। এইরূপ রাজসিক এবং তামসিক প্রকৃতিরও মানুষ আছে, তাহাদের আহার্য পানীয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির মনুষ্যগণ হইতে ভিন্ন—ইহা গীতা প্রভৃতি হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যু সকল প্রকৃতির মানুষেরই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মরণের পর আবার যখন তাহারা পরলোক হইতে ফিরিয়া আসে, তখন তাহাদের জন্ম ইহলোকে তাদৃশ প্রকৃতির জীব বা মনুষ্যকুলে ঘটিয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

উৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকৃতির মনুষ্যগণ মরণের পর উৰ্দ্ধলোকে অর্থাৎ যে লোকে গিয়া আর ফিরিয়া আসিতে হয় না তাদৃশ লোকে গমন করে এবং যাহারা রাজসিক প্রকৃতির মানুষ তাহারা মরণের পর মধ্যলোকে যেখানে সদসৎ পাপপুণ্যময় কর্মফল ভোগ করে সেখানে অবস্থান করিয়া পুণ্যবিশেষের দ্বারা উৰ্দ্ধলোকে চলিয়া যায় অথবা ইহলোকে আসিয়া "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে" জন্মগ্রহণ করে—এই কথা পরলোক সম্বন্ধে লিখিত বিবিধ পুস্তকেও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজসিক প্রকৃতির মনুষ্যমাত্রেই ইহলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং বিবিধ কর্মের দ্বারা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, তাহারা অত্যুৎকট কর্মদোষে লোকান্তরে ভূতপ্রেতরূপে অবস্থান করে এবং ইহলোকে যাহাদের প্রতি তাহাদের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, তাহাদের বিবিধ প্রকার অনিষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহারাই বহু সময়ে রোগরূপে আসিয়া বিবিধ প্রকার দুঃখ দেয়, কখনও বা তাহাকে জীবনের পরপারে লইয়া যায়। এ সম্বন্ধে বহু প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিচয় অনেক বৃদ্ধ বৈদ্যগণের জানা আছে। কিছু আমারও বিদিত। আয়ুর্বেদের ভূতবিদ্যা এবং অথর্ববেদের মণিমন্ত্র শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির ভিত্তি-ভূমি এই তামস প্রকৃতির পরলোকগত মানুষ বা বিদেহী আত্মা—যাহাদিগকে ভূতপ্রেত বলা হয়। ভূতপ্রেত অনেকে স্বীকার করে না, কিন্তু ভূতপ্রেতগণ সে বিষয়ে উদাসীন—ইহা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহেও দেখা যায়।

এখানে আর একটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। মানুষে ভাবে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা ছাড়া আর কিছু নাই। কিন্তু এই দেখা-জগতের পরপারে আরও কত না-দেখা জগৎ আছে তাহার সংবাদ কয়জনে জানে। প্রাচীন ভারতীয়গণের মধ্যে একটা সাধারণ ধারণা ছিল—এই চতুঃসাগর সমাবেষ্টিত ভারতবর্ষই পৃথিবী। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয়গণের মধ্যে কেহই তাহা বিশ্বাস করে না। বর্ত্তমানে একটা পৃথিবীর মধ্যেই মহাদেশরূপে কত যে পৃথিবী আছে, তাহা এখন অনেকে না দেখিয়াও বিশ্বাস করিয়া থাকে। সেইসব দেশের আকৃতি প্রকৃতি আহার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম কত যে ভিন্ন তাহা বলা যায় না। এইরূপ মরণের পরেও বহু বহু লোক বা স্থান আছে। সেই সকল স্থানের লোক বা জীবগণের স্থূল দেহ না থাকিলেও সূক্ষ্ম মনের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি কত যে ভিন্ন তাহা প্রত্যক্ষ না করিলেও এদেশীয় পরলোক সম্বন্ধ লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায়। এইজন্য মহর্ষি আত্রেয়ের কথা মনে হয়—"বুদ্ধিমান্ নাস্তিক্যং জহ্যাৎ। স্বল্পং প্রত্যক্ষমনল্পমপ্রত্যক্ষম্"—যাহা দেখা যায় তাহা নগণ্য, সীমায় আবদ্ধ। আর যাহা দেখা যায় না তাহা যেমন অসীম তেমনি অনন্ত। কিন্তু তাহা শুনিবে কে, মানিবেই বা কে? এইখানে আমার একটা কথা মনে হয়—মানুষের মত ভগবানেরও বোধ হয় ভুল হয়, যাহার জন্য তিনি মানুষকে এমনই একটা ভ্রান্ত সর্বজ্ঞতার অভিমান দিয়াছেন, যাহার জন্য মানুষ অপরের সত্যকে অসত্য আর নিজের অসত্যকে সত্য বলিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। "অহো বিচিত্রা জনানাং খলু চিত্তবৃত্তিঃ।"

কতকগুলি রোগের বহিঃপ্রকাশ আছে, কতকগুলির তাহা

নাই—ভিতরে ভিতরে তাহাদের কাজ চলে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহা বেশ বুঝিতে পারেন—জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিয়াও থাকেন। এইরূপ বিশ্ব প্রকৃতির কার্যেরও বহিঃপ্রকাশ ও অন্তঃপ্রকাশ আছে। বহিঃ-প্রকাশ এই স্থূল বিশ্বে ইহলোকে দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে পারা যায়, জানিতেও পারা যায়। আর অন্তঃপ্রকাশ, পরলোকে সৃষ্ট জগতে প্রকাশ পায়—সে সকল এই জগতের স্থূলদর্শীদিগের অজ্ঞেয়। কিন্তু যোগী ঋষি বা তাদৃশ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহোদয়গণের জ্ঞানের বাহিরে নহে। এই জগতে যেমন কোন চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি গতকাল, অদ্যকার ও আগামীকালের অবস্থা চিন্তা বা ধ্যাননেত্রে দেখিয়া থাকেন, তেমনি ভারতীয় আর্যমহর্ষিগণ ইহলোক ও পরলোকে—বিরাট বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় কর্ম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একই সঙ্গে দেখিতে পান—দেখেনও। ইহা অবিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। কেননা, এই পৃথিবীতে ভারত, চীন, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি কত মহাদেশ ও প্রদেশ আছে, সে সমস্ত স্থানে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে, তাহাদের আচার ব্যবহার কর্ম, অধর্ম সবই যথানিয়মে আপনা হইতে চলিতেছে, সে সব জানে কয় জনে। কিন্তু জানে এমনও অনেক লোক আছে, যাহারা যুক্তি তর্ক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন পুস্তক প্রভৃতি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করেন। তাঁহাদের জ্ঞানদৃষ্টি সাধারণ লোকের জ্ঞানদৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই যে এখন বেলা পৌনে দশটা, আমার নিকটে কেহ নাই, আমি একাকী বসিয়া লিখিতেছি, এই সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোক কিছু চুপ করিয়া বসিয়া নাই, নিশ্চয়ই কিছু না কিছু করিতেছে

—ইহা প্রত্যক্ষ না করিলেও যুক্তি অনুমান অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, অপরকেও বুঝান যায়। এইরূপ যে সকল অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহাদের কথা প্রাচীনকালে আপ্তবাক্য বলিয়া পরম সমাদরে গৃহীত হইত, এখনও হইয়া থাকে—অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ-ভাবে প্রাচীন আর্য মহর্ষি অধ্যাত্মবাদিগণের এবং বর্ত্তমানের পাশ্চাত্ত্য আস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ—যাঁহারা এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দৃষ্টির মত পর-লোকের সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আপ্তবাক্যের মত বিশ্বাস করা উচিত। এইজন্য প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'শাস্ত্রীয়ং মহাশাস্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ',— অর্থাৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নিভৃত তত্ত্ব ও তথ্য সকল যে কোন লোককে বলিবে না, তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। যেমন, সিমেণ্ট দিয়া বাঁধান জমিতে কোন বীজই অঙ্কুরিত হইতে পারে না, তেমনি সাধারণ লোক, যাহারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত করে, তাহারা নিজের অনভিজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিবে—"আমি ইহা বিশ্বাস করি না।" কিন্তু তাহার বিশ্বাস করিবার মত যোগ্যতা আছে কিনা কেহ ভাবে না।

এইজন্য আমার একান্ত অনুরোধ — যাঁহারা পরলোকের তত্ত্বসমূহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উচিত এই সকল দুর্বিজ্ঞেয় পরলোক তত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ভারতীয় সত্যবাদী মহর্ষিগণ লিখিত পুরাণ, ইতিহাস এবং ধর্মশাস্ত্র সকল তত্ত্বদর্শী গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি-গণের নিকট শ্রদ্ধাপুরঃসর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসুর মনোবৃত্তি লইয়া

শ্রবণ করা, চিন্তা করা এবং সংশয় উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় — মহর্ষি গৌতমের পুত্র শ্বেতকেতু তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া এবং পাশ করিয়া এমন পরিচয় দিতে লাগিলেন যেন কেহ কিছু জানে না, বোঝেও না—যা কিছু জানি বা বুঝি সে আমি। পিতা গৌতম পুত্রের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া যে সকল অপূর্ব উপদেশ সহজ সুন্দর-ভাবে দিয়াছিলেন, সে-সকল এখনও অনেকে পড়িয়া দেখিতে পারেন। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে নিজেকে অজ্ঞানী মনে করিতে হয়।

পরলোকের সঙ্গে ইহলোকেরও একটি অপূর্ব মধুময় সম্বন্ধ আছে। তাহা এই পরলোকসম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল হিন্দুমনোভাবাপন্ন দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালের হিন্দুগণ দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার যজ্ঞ করিতেন। যাহার ফলে দেবগণ ও পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া যজমানগণের বিবিধ প্রকার কল্যাণ করিতেন। এইজন্য গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥"

দেবগণ যেমন অপ্রত্যক্ষরাজ্যে বাস করেন, তেমনি লোকান্তরগত পিতৃপুরুষগণ বা আত্মীয়স্বজনও অপ্রত্যক্ষলোকের অধিবাসী। দেবতাগণের মত তাঁহারাও ইহলোকে অবস্থিত পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনগণের শ্রদ্ধাপূত চিত্তে প্রদত্ত অন্ন পানীয়াদি পবিত্র ভোজ্য

দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া কেবল সন্তুষ্ট হইয়াই ক্ষান্ত হয়েন না, বহু বহু উপকার করিতে থাকেন। সেই সকল অপূর্ব অসম্ভাবিত লোকান্তরগত আত্মীয়স্বজন প্রদত্ত উপকারসমূহকে বর্ত্তমানে অনেক মানুষই 'আমার ভাগ্যে ছিল', অথবা 'আমার প্রভাব-লব্ধ' বলিয়া মনে করে। কেহ একবারও ভাবে না যে, ইহা দেবতার প্রসাদ বা পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের আশীর্বাদ বা দান। ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের যে কি সম্বন্ধ তাহা চিন্তা করিলে সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে যাহারা ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানে আয়োজন করে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের মত গত অনাগত, ও আগত আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধ ইহা পরলোক-পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

মরণের পরে ও পূর্বে, মানুষের সুখ ও দুঃখের হেতু মানুষই—অপর কেহ নহে। কিন্তু মানুষের এমনই একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যে, সে কখনই নিজের দোষ স্বীকার করে না। দেবতা, ভাগ্য, বিধাতাপুরুষ, এমন কি ভূত-প্রেতের উপরেও দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের হেতু নির্দেশ করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকে। কিন্তু দেবতারা যদি মানুষের মত কথা বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ না করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। মানুষের যাবতীয় সুখ, দুঃখ ও ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা সত্যদর্শী প্রাচীন মহর্ষিগণই জানিতেন। এইজন্য মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—

নৈব দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচো ন রাক্ষসাঃ
ন চান্যে স্বয়মক্লিষ্টমুপক্লিশ্যভিমানবম্।

অতএব—

নাভিশংসেদ্ বুধো দেবান্ ন পিতৄন্ নাপি রাক্ষসম্
আত্মানমেব মন্যেত কর্ত্তারং সুখদুঃখয়োঃ।

অর্থাৎ দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি কেহই যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে নাই তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। অতএব তাহাদের নামে দোষ না দিয়া নিজেকেই দোষী করিবে, নিজের অসৎ কর্মের ফলে দুঃখ এবং সৎকর্মের ফলে সুখ মনে করিয়া আশ্বস্ত হইবে। কিন্তু মানুষের তাদৃশ মনোভাব এখন কাহারও দেখা যায় না, সকলে নিজের দুঃখ দারিদ্র্য উপস্থিত হইলে বলে, 'মা কালী, তোর মনে কি এই ছিল?' অথবা 'ঠাকুর তুমি এ কি করিলে—আমি জ্ঞাতসারে কোন পাপ করি নাই, চিরদিন তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, তথাপি আজ কিনা আমার এই অবস্থা?'

হইতে পারে মানুষ এই জীবনে কোন অপরাধ করে নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব পূর্ব জীবনের কৃত অপরাধ ও তাহার কর্মের ফল? তাহা তো দেহত্যাগের সঙ্গে মানুষ ত্যাগ করিতে পারে নাই—সে-সকলও মরণের পরে অবিনশ্বর আত্মার সঙ্গে অবিনশ্বরভাবেই এই জীবনে আসিয়া দেখা দিয়াছে, ইহারই নাম দৈব। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "স্বকৃতমপরিহার্যসবিনাশী পৌর্বদেহিকং দৈবসংজ্ঞকম", অর্থাৎ মানুষ পূর্বদেহে যে কর্ম করে, তাহার ফল সে পরিহার করিতে পারে না। কেননা তাহার বিনাশ নাই—ইহারই নাম দৈব। লোক কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী, তাহারা পরোক্ষকে বিশ্বাস করে না। প্রাক্তন কর্মফলের প্রদাতা দেবতাকেও দেখিতে পায় না। সেজন্য দৈবের স্থানে দেবতাকে বসাইয়া, দেবতার পূজার্চ্চনা করে। স্বকৃত কর্মের ফল

বলিয়া মনে করিয়া কোন দেবতার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করে না—'ঠাকুর আমার পূর্বকৃত কর্মের ফলে এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম'—এইরূপ কথা বলিতে বড় একটা শোনাও যায় না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেবী অহল্যাকে অভয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে ॥
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

অর্থাৎ যে কোন জীব যদি আমার শরণাগত হইয়া একবার মাত্র বলে, "ঠাকুর, আগি তোমার সন্তান—বড়ই বিপন্ন—ভীত, আমাকে তুমি উদ্ধার কর,—তাহা হইলে আমি তখনই তাহা করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত।" কিন্তু বর্ত্তমানে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে জানে কয়জন ? আর শরণাগতি ? তাহা কোষ্ঠিতে লেখে না।

মানুষের স্বকৃত কর্মের ফলে ইহলোকে দুঃখ কষ্টের অবধি থাকে না। অথচ মানুষ অদৃষ্ট দেবতার উপর চাপাইয়া দিয়া নিজেকে নির্দোষ বলিয়া মনে করে। ইহা মনুষ্যপ্রকৃতির একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য।

অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা।
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানম্
স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ।

অর্থাৎ সুখ কেহ দেয় না, দুঃখও কেহ দেয় না। অপরের অনুগ্রহে আমার ভাগ্য ফিরিয়াছে, তাই আমার এই সুখ, অথবা আমার

যাবতীয় দুঃখের মূলে অমুক। ইহার মত বিকৃতবুদ্ধি আর হয় না। আর যদি বল—আমি নিজের চেষ্টার ফলে আমার অবস্থা ফিরাইয়াছি —তাহা হইলে শত চেষ্টাতেও দুঃখ দুর্ভাগ্যকে দূর করিতে পার নাই কেন? বৃথাই তোমার কর্তৃত্বের অভিমান। তবে ইহা সত্য যে, মানুষ দাতা বা কর্তা না হইলেও কর্মফলের ভোক্তা, সেইজন্য মানুষ সৎকর্মের ফলে সুখ এবং দুষ্কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এই সৎ ও অসৎ কর্মের ফল এমনই অব্যর্থ যে কখনও তাহা বিফল হয় না। সেইজন্য মানুষের কর্মফল যদি ইহজীবনে অভুক্ত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে পরজীবনে তাহা ভোগ করিতেই হয়। সেইজন্য মানুষ যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে যায় তখনই তাহাকে পরলোকেই সে সকল কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়। তাহাতেও যদি ভোগের নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে ইহলোকে আসিয়াও তাহা ভোগ করিতে হয়। এই ভোগের জন্যই তাহাকে এমন স্থানে ও এমন পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয় যাহাতে তাহার কর্মফলের ভোগ হয়। এই বিশ্বসংসারের যাঁহারা পিতামাতা—সকল মানুষই তাঁহাদের সন্তান, এমন কি পশু পক্ষী কীট পর্যন্ত। ইহাদের প্রত্যেকেরই কর্ম আছে এবং সেই কর্মের ফলও আছে। যাহার জন্য সৎকর্মের ফলে মানুষের পরলোকেও সুখ-সৌভাগ্য ঘটে আর ইহলোকে বিবিধ প্রকার সুখময় অবস্থায় জীবনযাপন করে। এইরূপ অসৎকর্মের ফলেও মানুষ পরলোকে ও ইহলোকে দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করিয়া থাকে। ইহা যদি না হইত তাহা হইলে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইত। সেই জন্য এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, যাহার

জন্য মানুষের কর্মফলের প্রভাবে এমনভাবে প্রকৃতির বৈচিত্র্য ঘটে, যাহাতে এই সংসারে কেহ কেহ নিজের সুখ সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য প্রভৃতি পরোপকারার্থে অম্লানবদনে বিসর্জন দিয়া থাকে—শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব মানুষকে এমন সব কর্ম করিতে হয়, যাহাতে তাহার "লোকয়োরুভয়োঃ হিতম্" অর্থাৎ ইহলোকের ও পরলোকের হিত বা কল্যাণ হয়। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র এই সকল কর্মের উপদেশে পরিপূর্ণ, যাহা অন্যত্র দুর্লভ।

এই জন্য ভগবান ধন্বন্তরী বলিয়াছেন—মানুষের অন্তরাত্মারূপে যে মানুষ বাস করে, সে ধর্মাধর্মের নিমিত্ত ইহলোকে দেবতা, মানুষ ও পশু প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—মানুষ যে সকল বস্তু বা বিষয় লইয়া এই জগতে বিরাজ করে, সে সকল তাহার যেমন সুখের কারণ, তেমনি দুঃখেরও কারণ। যেহেতু সেই বস্তু বা বিষয়ের ব্যবহার দ্বিবিধ—সৎ বা কর্ত্তব্য, অসৎ বা অকর্ত্তব্য এবং এই সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কর্মই একই সঙ্গে অবস্থান করে—মানুষকে তাহা বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেইজন্য মানুষের যাবতীয় শারীর ও মানস দুঃখের হেতু প্রজ্ঞাপরাধ অর্থাৎ বুদ্ধির দোষ। যেহেতু মানুষের সকল কর্মের মুল বুদ্ধি। বুদ্ধিই মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। সেজন্য বুদ্ধি পরিশুদ্ধ থাকিলে সে সকল কর্ম সম্পাদিত হয় যাহার ফলে মানুষের ইহলোকের ও পরলোকের কল্যাণ হয়, আর বুদ্ধি দোষযুক্ত হইলে তাহার ফলে ইহলোক ও পরলোকে সর্বত্র দুঃখ করিতে হয়। এই বুদ্ধির দোষের হেতু মানুষের সৎ-অসতের বিচার। তাহার হেতু—অসংযম,

অর্থাৎ নির্বিচারে বিষয়ভোগের প্রবৃত্তি, যাহার জন্য মানুষ সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ বলিয়া মনে করে, তাহার ফলও তদনুরূপ হয়। তাহারই জন্য মানুষকে সর্বদা সংযত হইয়া কার্য করিতে হয়, নতুবা কর্মফলে দুঃখ অনিবার্য হইয়া উঠে। কিন্তু মানুষ কখনই নিজের দোষ দেখে না, যত কিছু দোষ দেবদত্ত ভাগ্যফল। মানুষ একবারও ভাবে না—তাহার ভাগ্য সে নিজেই রচনা করিয়াছে। এইজন্য ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

'কারো দোষ নয় মা শ্যামা,
আমি স্বখাত:সলিলে ডুবিয়া মরি'।

মানুষের নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপান বোধ হয় অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। রাজা ভর্ত্তৃহরি একবার সাধারণ মানুষের ভূমিকায় বলিলেন—

"নমস্যামো দেবান্ ননুহতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধিবন্দ্যঃ সোঽপি নিয়তকর্মৈকফলদঃ"।

অর্থাৎ যত দুঃখের প্রতিকারকর্ত্তা দেবতাগণ, অতএব দেবদেবীর উপাসনা করা যাক্, তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করি, তাঁহারাই সকল দুঃখের প্রতিকার করিবেন। তারপর যখন তাঁহাদের পূজা অর্চনা প্রণাম প্রভৃতির দ্বারা কোন ফলই হইল না, অথচ নানা কারণে দেবতার অর্জিত ভক্তিরও কোন দোষ দেখা গেল না, তখন মানুষ মনকে প্রবোধ দিয়া বলিল—"ঠাকুর-দেবতায় করিবে কি? পোড়া বিধাতাপুরুষই যত অনিষ্টের মূল। অতএব বিধাতাপুরুষকেই প্রসন্ন করা যাক্।" তারপর বিধাতা পুরুষের কৃপায় যখন মানুষের মনে হইল—"বিধাতাপুরুষ তো আমার কৃতকর্মের ফল অন্যথা

করিতে পারেন না, আমি যেমন করি, তাহা নিখুঁতভাবে বিচার করিয়া তিনি মানুষকে ভাল-মন্দের ফল দিয়া থাকেন—নতুবা তাঁহার এই বিশ্বসংসার চালান সম্ভব হয় না, অতএব 'নমস্তৎকর্মভ্যো বিধিরপি ন যত্র প্রভবতি'। অতএব আমার কর্মকেই প্রণাম করি। সেখানে সর্বশক্তিমান্ বিধাতাপুরুষও সর্বশক্তিহীন। যেহেতু তিনি আমার কর্মফলের অধীন।"

মানুষের চরম ও পরম জ্ঞানের জন্য হিন্দুর অধ্যাত্মদর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব, ইহলোক, পরলোক, কর্ম, কর্মফল প্রভৃতি সুবিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল স্বীকার করিলে উচ্ছৃঙ্খল অসংযত স্বার্থপর প্রভৃতির স্বাধীনতা থাকে না। সেজন্য মানুষ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাসংস্কার জ্ঞান তদনুমত লোকাচার ও সামাজিক রীতি কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। জগতে এমন কোন বস্তু বা বিষয় নাই, যাহার সমর্থন করা যায় না। সেইজন্য ভারতীয়গণ এখন আপ্তপুরুষরূপে বিদেশীয়গণের মত ও পথ ধরিয়াছে। এ দেশে ছেলেবেলা হইতেই শেখান হইত—

আপদাং কথিতঃ পন্থাঃ ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

কিন্তু তাহারা জানিত না—শ্রেষ্ঠ চারু ও কারুশিল্প বায়স্কোপ থিয়েটার—এ সকলের কি হইবে? মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়?

———

অভিজ্ঞতাবলী

[এক]

মানুষ কথায় কথায় বলে মরণটা হলে বাঁচি। বাঁচে কি মরে তা সে জানে না, এজন্য আত্মহত্যাও করে। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেছেন—

"অতীন্দ্রিয়ৈস্তৈরতিসূক্ষ্মরূপৈঃ আত্মা কদাচিন্ন বিযুক্তরূপঃ।
ন কর্মণা নৈব মনোমতিভ্যাং ন চাপ্যহংকারবিকারদোষৈঃ॥"

মানুষের দেহের মধ্যে আর একটা দেহ আছে সেই দেহ অতিসূক্ষ্ম, আত্মার সঙ্গে নিত্যযুক্ত, আত্মা তাহা ত্যাগ করে না। তাহার সঙ্গে কর্ম মন বুদ্ধি যেমন থাকে, তেমনই আত্মা দেহধারণ করিয়া অহঙ্কারের বশে যে সকল কর্ম করে, সেই সকল কর্মের সৎ অসৎ ভাল মন্দ ফল পাপ পুণ্য সবই গাঁথা থাকে, সে সকল লইয়া মানুষ আবার জন্ম গ্রহণ করে। ইহার অন্যথা হয় না।

আমি তখন চিকিৎসক। খিদিরপুর হইতে যজ্ঞেশ্বরবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন,—তাঁহার পুত্রবধূ পীড়িত। রোগ মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছা সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায় না। তিনদিন পর্যন্ত থাকে, তারপর আপনা হইতে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন রোগিণী সহজ মানুষ। অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছে কিছুতেই কিছু হয় নাই।

যজ্ঞেশ্বরবাবু—যজ্ঞেশ্বর রায়, এ টি এস্, বি এন্ রেলওয়ে। খিদিরপুর মনসাতলা হরিসভা লেনে তাঁর বাড়ী।

আমি গিয়া রোগী দেখিলাম, হঠাৎ আমার মনে কতকগুলি কথা জাগিয়া উঠিল, আমি বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম—বাড়ী কি আপনি নিজে করিয়াছেন, না কিনিয়াছেন? বাড়ীখানি বেশ নূতনের মত।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বলিলেন—"তৈয়ারী করি নাই, কিনিয়াছি।" আমি বলিলাম—"বাড়ীর সঙ্গে একটি বিদেহী আত্মাকেও কিনিয়াছেন, তিনিই আপনার পুত্রবধূকে রোগরূপে পাইয়া আছেন—গয়াতে তাঁহাকে পিণ্ডদান করুন, রোগ সারিয়া যাইবে।"

এখানে একটা কথা—কে যেন আমার মনের মধ্যে ঐ কথা বলিয়া দিল। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ-কথা বলিলে যজ্ঞেশ্বরবাবু কি মনে করিবেন, আর গয়াতে গিয়া কাহাকে পিণ্ড দিবে, কেই-বা দিবে? তাহার নাম গোত্র কি? ইত্যাদি। আর ইনিই বা কি মনে করিবেন। আমি তো ভূতের ওঝা নহি। বিষম সমস্যা। এখন এ-কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সাধারণ চিকিৎসায় কিছুই হইবে না,—রোগিণী ভুগিতে থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, লৌকিক বা অলৌকিক সকল কথাতেই আমি অবিচারে বিশ্বাস করিয়া থাকি। কাজেই আমার মান অপমান উপহাস সব কিছু উপেক্ষা করিয়া যাহা মনে হইয়াছিল তাহাই বলিলাম। রোগীকে দুঃখ দেওয়ার চেয়ে নিজের অপমানও ভাল মনে হইল।

যজ্ঞেশ্বরবাবু আমার কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন—"বেশ ভালপথ ধরিয়াছেন। লোকের সঙ্গে যে 'কন্‌সাল্‌ট' করিব

তাহার উপায় নাই। যাক্—এখন আপনি 'প্রেস্‌ক্রিপসন' করুন, ভূতের কথা পরে হইবে।"

তাঁহার কথায় ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলাম, আর বলিয়া দিলাম —যথাশাস্ত্র যথাজ্ঞান ব্যবস্থা করিলাম, কিন্তু ইহাতে যে কিছু হইবে তাহা মনে হয় না।

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। অনেকদিন কাটিয়া গেল, কত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল,—কিন্তু রোগ বা রোগিণীর কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

যজ্ঞেশ্বরবাবু আমাকে না বলিয়াই একদিন এক পীরের দরগায় গিয়া খাদিমকে রোগিণীর কথা বলিলেন। খাদিমের কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল, তিনি অনেকের অনেক দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথা শুনিয়া বলিলেন, একটু বস, পরে বলিতেছি।

তারপর তিনি বলিলেন—"রোগিণীকে একটা অশরীরী আত্মায় পেয়ে বসেছে,—সেই আত্মা আমায় বলছে কবরেজ মশায়কে দিয়ে বলালাম—বিশ্বাস হলো না, এখন ভুগবে না তো কি? আমি ওকে নিয়ে যাবো।"

যজ্ঞেশ্বরবাবু বলিলেন,—'গয়ায় পিণ্ড দিতে কবিরাজ বলিয়াছিলেন। কাহাকে কি নামে পিণ্ড দিতে হইবে, কি গোত্র, কে দিবে কিছুই বলিয়া যান নাই।'

খাদিম তখন বলিলেন,—"বস, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেছি।"

তারপর তিনি সেই অশরীরী আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নাম

গোত্র ইত্যাদি যাহা কিছু পিণ্ডদানকালে জ্ঞাতব্য বলিয়া দিলেন। আর বলিলেন—অশরীরী আত্মা ব্রাহ্মণ-কন্যা, পিণ্ডাধিকারিণীর কেহ নাই, যাহাকে হউক কাহাকেও দিয়া পিণ্ড দিলেই চলিবে, তবে সে যেন ব্রাহ্মণ হয়।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর নিকট কর্মপ্রার্থী হইয়া একটি ব্রাহ্মণ-তনয় ছিলেন —তিনি তাহাকেই নাম গোত্র সব কিছু দিয়া গয়াতে পাঠাইয়া দিলেন, সে গিয়া পিণ্ড দিয়া আসিল। রোগিণী রোগমুক্ত হইল। তখন একদিন যজ্ঞেশ্বরবাবু আসিয়া আমায় সব বলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমায় এই প্রসঙ্গে বলিয়া-ছিলেন,—"গয়াতে পিণ্ড দিলে মোক্ষ হয় না, মুক্তি হয়। বিদেহী আত্মা যে অবস্থায় থাকে, তাহার সেই অবস্থা হইতে মুক্তি হইলে সে যাতনাময় দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, আবার সৎকর্মের অধিকারী হয়।"

[দুই]

অনেক দিনের কথা। ডাঃ যতীন্দ্রশঙ্কর রায় হ্যারিসন রোড বেনেটোলায় একটি রোগিণীর কাছে আমায় লইয়া গেলেন। রোগিণী বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। প্রথমে যতীনবাবু নিজেই চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিছুই না হওয়ায় ডাঃ সরকার 'লিভারে ক্যানসার' বলিয়া অনেক দিন চিকিৎসা করিতেছিলেন, উপকার না হওয়াতে ডাঃ দাস (কেদারনাথ দাস) আসিয়া 'জরায়ুতে ক্যানসার' বলিয়া অনেক দিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছু না হওয়াতে এখন আমাকে কেসটি দিতেছেন।

রোগিণী শয্যাগত। কিছু খায় না, শরীর জীর্ণশীর্ণ, উঠিয়া বসিতে পারে না।

অনেক দেখিলাম — শুনিলাম, কি রোগ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

"বিকারনামাকুশলো জিহ্রীয়াৎ ন কদাচন।
নহি সর্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ॥"

রোগের নাম বলিতে না পারিলেও লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। কেননা, এমনও অনেক রোগ আছে, যাহাদের কোন নাম নির্দিষ্ট নাই। রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ প্রভৃতি দেখিয়া সে-সকল রোগের চিকিৎসা করিতে হয়—ফলও পাওয়া যায়।

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া বলিলাম,—চারদিন আমি চিকিৎসা করিব, তাহাতে যদি কিছু ফল হয় তো আমি চিকিৎসা করিব, নতুবা অন্য কাহাকেও দেখাইতে হইবে।

চার দিনের পরে গিয়া দেখিলাম—রোগিণী বেশ সুস্থ. কোন উপসর্গ নাই, উঠিয়া বসে, চাহিয়া খায়—আত্মীয়স্বজনের সহিত কথাও বলে।

"ন তথা কৃতবেদিনাং করিষ্য ন প্রিয়ভাসে যথা কৃতাবদানঃ।"—যাহাতে ভাল হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে নাই। তাই আমি অন্য ব্যবস্থা না করিয়া সেই ঔষধই আবার চার দিনের জন্য খাইতে বলিয়া আসিলাম।

আবার চার দিনের পরে গিয়া দেখিলাম রোগিণীর যে উপকার হইয়াছিল তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বিশেষ চিন্তিত হইয়া ভাবিতে

লাগিলাম। এই সময়ে হঠাৎ একটি শ্লোক মনে হইল। কে যেন শ্লোকটি আমায় বলিয়া দিয়া গেল। যথা—

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রক্ষাংসি বিবিধানি চ
মরণাভিমুখং নিত্যমুপসর্পন্তিমানবম্।
তান্যৌষধবীর্য্যাণ্যুপহন্তি জিঘাংসয়া
তস্মাৎ সর্বাঃ ক্রিয়া মোঘা ভবন্তি বিগতায়ুষঃ॥

—ভূত প্রেত পিশাচ ও রক্ষঃ প্রভৃতি বিবিধ অলৌকিক বস্তু বা বিদেহী আত্মা আছে, তাহারা মরণোন্মুখ মানুষের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাকে মারিবার জন্য ঔষধের শক্তি নাশ করিয়া দেয়। সেইজন্য তাহাদের চিকিৎসায় কিছু হয় না, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম কে আমায় এই কথা বলিয়া গেল। তারপর আমি যেন অজ্ঞাতসারে রোগিণীর অভিভাবক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কোন আত্মীয়স্বজনের পার-লৌকিক ক্রিয়া বাকী আছে? তখন রোগিণী স্বয়ং বলিয়া উঠিল—আশ্চর্য, আপনি জানিলেন কি করিয়া, আমার বাবার শ্রাদ্ধ হয় নাই। তিনি রোজ আমার কাছে আসিয়া বলেন—'মা, তুই আয়। তোর মরণের পর যে শ্রাদ্ধ-শান্তি হইবে তাহাতে আমিও জল পিণ্ড পাইয়া এই যন্ত্রণাময় অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইব।' এই বলিয়া তিনি বলিলেন—আমার ভাই বলে 'মরা গরুতে কি ঘাস খায়, শ্রাদ্ধ-শান্তি পিণ্ডদান সবই মিথ্যা, সবই হিন্দুদের কুসংস্কার, ব্রাহ্মণদের কিছু আদায় করিবার ফন্দী। মানুষের মরণের পরে কিছু থাকে না।

আমি যা মানি না তা করিব না।' রোগিণীর ভাই (বরদাকান্ত দত্তগুপ্ত) তখন বিদ্যাসাগর কলেজের কমার্সের অধ্যাপক, এখন পরলোকে।

রোগিণীর কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্র কি মনে করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আমায় বলিলেন, এখন ব্যবস্থা ?

বলিলাম—গয়াতে আপনাকে পিণ্ডদান করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়, নতুবা আপনার মায়ের রোগ সারিবে না, মৃত্যুও হইতে পারে। তবে যতদিন না গয়াতে গিয়া পিণ্ডদান করা হয় ততদিন আমি অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসা করিয়া যাইব।

রোগিণীর পুত্র (ভূপেন্দ্রনাথ রায়) কলিকাতায় ছোট আদালতের উকীল। তখন কার্ত্তিক মাস, বোধ হয় জগদ্ধাত্রী পূজার সময়। তিনি বলিলেন—এখন আমার হাতে অনেক মক্কেল। বড় দিনের ছুটিতে গয়া যাইতে পারি। আমি বলিলাম, ততদিন আপনার মা না বাঁচিতেও পারেন। শুনিয়া বলিলেন, তাহা হইলে কার্ত্তিক পূজার সময় যাইতে পারি।

গয়াতে আমার একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি ডাক্তার। পিণ্ড-দানের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাঁহার নামে একখানি চিঠি লিখিয়া উকীলবাবুকে দিয়া বলিলাম,—"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি", সাবধানে যাইবেন, অনেক বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

দৈবক্রমে কার্ত্তিক পূজার পূর্বে উকীলবাবুর কলেরা হইল। চিকিৎসায় সারিয়াও গেলেন, আমার কথায় যেন বিশ্বাস আসিল। কিন্তু কার্ত্তিক পূজার সময় তাঁহার গয়া যাওয়া হইল না। ৯ই অগ্রহায়ণ উকীলবাবু গয়ার ট্রেনে সবেমাত্র বসিয়াছেন, তখন তাঁহার এক ভাই গিয়া বলিল, মামাকে পুলিশে ধরিয়াছে, তুমি

আসিয়া জামিন দিয়া খালাস না করিলে মামাকে হাজতে যাইতে হইবে। তখন স্বদেশী যুগ।

উকীলবাবু দেখিলেন আবার বাধা। তিনি ভাইকে বলিলেন, 'তুমি অন্য কোন উকীলকে দিয়া জামিনের ব্যবস্থা কর—নতুবা মামা এখন হাজতেই থাকুন, আমি আর নামিব না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মধ্যরাত্রে গাড়ী যাইতে যাইতে লাইনচ্যুত হইল। তিন ঘণ্টা পরে গাড়ী ছাড়িল। যে গাড়ী সকালে ৬টায় গয়াতে আসিবার কথা তাহা আসিল বেলা ৯টায়।

উকীলবাবু আমার চিঠি লইয়া ডাক্তারবাবুর নিকট না গিয়া একটা ধর্মশালায় উঠিলেন। একজন পাণ্ডাকে লইয়া ফল্গু নদীর তীরে পিণ্ড দিতে গেলেন।

এদিকে আমি সেই পিণ্ডদানের দিনে রোগিণীকে আবার দেখিতে গেলাম, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। রোগিণীকে দেখিয়া সব জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছি এমন সময় আমার শরীরটা হঠাৎ কেমন খারাপ হইয়া গেল। আমি প্রায়ই হৃদ্‌রোগে ভুগিতাম, মনে হইল আমার মৃত্যু আসন্ন। মনে মনে বলিলাম, ঠাকুর, মারিতে হয় বাসায় লইয়া গিয়া মারিও। এখানে মৃত্যু হইলে ইহাদের বিপদে পড়িতে হইবে, আমার দেহেরও কত দুর্গতি হইবে। মনে মনে যখন এই চিন্তা করিতেছি তখন আমার মনে হইল আমার শরীর অত্যন্ত লঘু, চিত্ত আনন্দময়, চোখের সামনে একটা অপূর্ব জ্যোতিঃ। ঘড়িতে দেখিলাম তখন বেলা ১০টা বাজিয়া ৩৫ মিনিট। রোগিণীকে দেখিলাম, দেখিয়া বলিলাম, মা, তুমিতো বেশ সারিয়া গেলে!

উত্তরে তিনি বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, সত্যই সারিয়া উঠিলাম।

আমার আর কোন রোগযন্ত্রণা নাই, শরীর মন সবই সুস্থ, সবই প্রসন্ন। একটু আগে আমার বাবা আসিয়া আমার মাথায় 'কর জপে দিয়া' বলিলেন, মা তুই সেরে ওঠ, তোর কৃপায় আমার সদ্‌গতি হল। রোগিণী উঠিয়া হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'বাবা তুমি সিদ্ধপুরুষ, আমার শত অপরাধ মার্জনা কর।'

আমিও সহজ মানুষ হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বাসায় ফিরিলাম। মনে একটা অপূর্ব ভাব, সবই আনন্দময়।

পিণ্ডদানের তিন দিন পরে উকীলবাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ১০টা ৩৫ মিনিট সময়ে পিণ্ডদান করা হল? পিণ্ডদানের পরে কি হইল বলুন।

উকীলবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন—থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য, আপনি সিদ্ধপুরুষ না যাদুকর? ১০।৩৫ মিনিটে পিণ্ড দিলাম আপনি জানিলেন কেমন করিয়া? আমি অবশ্য ঘড়ী দেখিয়া রাখিয়াছিলাম। আপনার সঙ্গে কথা কহিতেও ভয় হয়।" তারপর বলিলেন, "আমার পিণ্ডদান শেষ হইতেই দেখি—একটা সাদা গরু কান খাড়া করিয়া লেজ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। যাহারা ফল্গুতটে পিণ্ডদান করিতেছিল তাহারা সকলেই পিণ্ড ও জিনিষপত্র সব ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। আমিও ছুটিয়া অন্য স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম গরুটা কাহারো কিছু না করিয়া একেবারে আমার দেওয়া পিণ্ড সবটা খাইয়া ফেলিল—কলাপাতা পর্যন্ত। তারপর কোথায় যে চলিয়া গেল তাহা আর দেখিতে পাইলাম না।"

আশা করি, যাঁহারা আমায় চেনেন বা জানেন তাঁহারা আমার

এই কথা বা লেখা পড়িয়া বিশ্বাস করিবেন। হিন্দুর শাস্ত্র বা কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাড়িবে।

বর্ত্তমানে অনুসন্ধানে জানিয়াছি রোগিণী এখনও বাঁচিয়া আছেন, তবে জরাবার্দ্ধক্যের অধীনে।

এইরূপ দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা অথর্ববেদ এবং তদনুগত আয়ুর্বেদীয় সংহিতা গ্রন্থে দেখা যায়। সেজন্য বলি হোম শান্তিস্বস্ত্যয়ন মণিমন্ত্র প্রভৃতি প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কুসংস্কার বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইতেছে। এখনও যে সকল রোগী দুরারোগ্য রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের মধ্যে কতজন প্রাক্তন কর্মবিপাকে বিপন্ন হয়, কে তাহা বলিবে।

[তিন]

অনেক দিনের কথা। একদিন সকালে বিধু আসিয়া উপস্থিত। তখন আমি কবিরাজ, থাকি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে। বিধু—বিধুভূষণ দত্ত ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে এবং তৎপরে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিত, সেখান হইতে অবসর লইয়া কলিকাতা আসিয়া "ভারতের সাধনা" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিত। তা'ছাড়া আরো কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিল। তাহার একটি নিজস্ব ছাপাখানাও ছিল। এখন সে পরলোকে।

বিধু বলিল—'চল, তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাই। তুমিতো মরণের পরে মানুষের অবস্থা জানতে ব্যস্ত ? অমিয় নিমাই চরিতের রচয়িতা, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা শিশির ঘোষ

মহাশয় সম্প্রতি দেহত্যাগ করেছেন। তিনি এখন তাঁহার বন্ধু নগেনবাবুর কাছে আসেন, অনেক কথা বলেন, সেই সকল কথা আবার তাঁহার ছেলেরা শুনে যায়।'

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য। সিমলায় মধু রায় লেনে একটি বাড়ী, পারিবারিক ব্রাহ্ম মেস। বিধু সেখানে গিয়া তাহার একটি পরিচিত লোককে বলিল—'আমরা নগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।' লোকটি আমাদিগকে লইয়া গিয়া তাহার ঘরে বসাইয়া চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, 'যান, ঐ ঘরে নগেনবাবু আছেন, এখন অন্য কোন লোকও নাই। ভালই হয়েছে।'

ঘরে ঢুকিয়া দেখি একজন বৃদ্ধ, বেশ শান্ত ভাব। একলা বসিয়া আছেন। সামনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি বই, কিছু কাগজপত্র। ডানদিকে একটি ছোট জলচৌকিতে একখানা কাগজে পেন্সিল দিয়া তাঁহার হাত লিখিয়া চলিতেছে। মনে হইল তাঁহার সঙ্গে তাঁহার হাতের কোন সম্বন্ধ নাই, হাত আপন মনে লিখিয়া চলিয়াছে।

ঘরে ঢুকিতেই তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'এসেছ? সঙ্গে কে?'

নগেনবাবুকে আমি পূর্বে দেখি নাই, তিনিও আমায় কখনও দেখেন নাই। অথচ সম্ভাষণ করিলেন পূর্ব পরিচিতের মত। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—'ইনি আমার একজন বন্ধু। ইনিই আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন।'

নগেনবাবু বলিলেন—'তোমার বন্ধু নয়, আর একজনকে যে তোমার সঙ্গে দেখছি।'

নগেনবাবু—'তোমার বন্ধুটিকে পাশের ঘরে বসিতে বল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বিধু চলিয়া গেল পাশের ঘরে পরিচিত লোকটির কাছে। আমাকে বসাইয়া বিধুকে সরাইয়া দেওয়াতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'উহাকে এখানে থাকতে দিলেন না কেন?'

উত্তরে নগেনবাবু বলিলেন, 'অবিশ্বাসী। যে যে-বিষয় বিশ্বাস করে না, তার কাছে সে-বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ করিতে নাই' বলিয়াই তিনি আপন মনে বলিলেন—"শাঙ্করীয়ং মহাশাস্ত্রং, ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।"

আমি বলিলাম—'আপনি যাহা যাহা বলিবেন সে সমস্তই তো আমি উহাকে বলিব।'

'তা তুমি বলিতে পার, আমি তো বলিব না।' তারপর তিনি বলিলেন—'তোমার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনিই তোমাকে এখানে এনেছেন, তুমি তাঁহাকে দেখ নাই। কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গেই থাকেন, অনেক কিছু করেছেন, অনেক কিছু বলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তুমি তা বুঝতে পার নাই, তাই আমার কাছে এনেছেন—আমার মারফৎ কিছু বলবার জন্য।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কে ইনি? ইঁহার পরিচয় কী?'

উত্তরে নগেনবাবু বলিলেন—'উনি বলছেন পরিচয় পরে হবে। সময় হলে দেখাও হবে।' এই বলিয়া পুনরায় বলিলেন—'উনি বলছেন তোমার দুইজন মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে, তাঁদের দ্বারা তুমি বিশেষ উপকৃত হবে। তারমধ্যে একজনের দ্বারা জীবনের পরেও।' এই বলিয়া আমার অতীত জীবনের অনেক ঘটনা বলিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনেরও।

জীবনের অতীত ঘটনা সব আমার জানাই ছিল—ভবিষ্যতের কথা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও পরে সব মিলিতে দেখিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি মরণের পর মানুষের কি হয় বলিতে পারেন ?'

নগেনবাবু বলিলেন—'মরণের পর মানুষের কি হয় আগে বলিতে পারতাম না। এ সম্বন্ধে কখন কোন চিন্তাও করি নাই, এখন অনেক কিছু পারি'—এই বলিয়া তিনি আমায় কোন্ কোন্ মানুষের কি কি প্রকার গতি হয়, স্বর্গ-নরক, জন্মান্তর-লোকান্তর, কয়টা লোকান্তর আছে, সেখানে কাহারা থাকে, তাহাদের আচার-ব্যবহার, কাহারা আবার ইহলোকে আসিয়া স্থূলদেহ ধারণ করে, কাহারা আবার ঊর্দ্ধলোকে চলিয়া যায়, সে সব বলিলেন। অধিকন্তু দেব-দেবী, গয়ায় পিণ্ডদানের ফলে কি প্রকার মুক্তি হয়, ইত্যাদি বহু কথাই বলিলেন।

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি এ-সব জানিলেন কি প্রকারে ?'

উত্তরে নগেনবাবু বলিলেন—'বিজয় আমাকে সব বলেছে, দেখিয়েও দিয়েছে। বিজয়—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, তুমি বোধ হয় তাঁর নাম শুনেছ। তিনি এখানেই ছিলেন, একটু আগে উঠে গেছেন, নইলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি তো আমার সঙ্গে বেশ কথা বলিয়া চলিয়াছেন, অথচ দেখিতেছি আপনার হাত অবিরত লিখিয়াই চলিতেছে। ও-কি, আপনি লিখিতেছেন না ?'

নগেনবাবু বলিলেন—'না, আমি লিখি নাই, বঙ্কিম লিখছে।

বঙ্কিম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত লেখক, ঔপন্যাসিক। বঙ্কিম আমার বন্ধু। বিজয়কে বলেছিলাম আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কার সঙ্গে তোমার দেখা হয়? পারতো ডেকে দিও বা সঙ্গে নিয়ে এসো। তাই বিজয় বঙ্কিমকে নিয়ে এসেছে।'

'বঙ্কিম আসতেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুমি কোথায় থাক, কি কর, সেখানে আর কারা সব থাকে বলতে পার?

উত্তরে বঙ্কিম বলেছিল—সে অনেক কথা। বলতে পারি, লিখে দিতেও পারি। কিন্তু আমার তো লেখবার মত হাত নেই, লেখবার কোন উপকরণও নেই। তবে তোমার যদি হাতটা দাও আর কাগজ কলম বা পেন্সিল দাওতো আমি অনেক কথাই লিখে দিতে পারি। তাই আমি বঙ্কিমকে আমার হাত, কাগজ ও পেন্সিল দিয়েছি, সে লিখছে। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।'

আমি কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে পাইলাম না। অথচ কাগজে লেখা চলিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

শুনিয়াছি সেই বিদেহী আত্মার লেখা তদানীন্তন "নব্যভারত পত্রিকায়" "বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকথা" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রথমেই বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন—"মরণের পরেও যে কলম ধরিতে হইবে তাহা জানিতাম না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আচ্ছা, বলুনতো আপনার এরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল? গোসাঁইজীর সঙ্গেই বা দেখা হইল কি করিয়া?'

উত্তরে নগেনবাবু বলিলেন—'শুনতে চাও? শোন'—

'আমি তখন কৃষ্ণনগরে থাকি। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের উপাসক

ও প্রচারক। আমার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। প্রতিদিন সকালে বসে একাই উপাসনা করি। আগে আমরা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসেই উপাসনা করতাম। একাকী উপাসনা করার পরেই মনে হত কে যেন আমার কাছে এসেছে, অথচ কোন লোক দেখতে পেতাম না। একদিন উপাসনার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—'কে? কে তুমি?' দু' তিন বার জিজ্ঞাসার পর দেখি ছায়ামূর্ত্তিতে আমার স্ত্রী।

আমি বললাম—তুমি? তোমার তো মৃত্যু হয়েছে, তুমি কি করে এখানে?

উত্তরে তিনি বললেন—মৃত্যু? মরণ? মরণ কি আছে? দেশান্তর, গেহান্তরের মত দেহান্তর। আমি মৃত্যুর পর থেকেই তোমার সঙ্গে আছি। তুমি দেখতে পাও না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ? তিনি উত্তরে বললেন, ভাল নয়। তোমায় ছেড়ে বড়ই দুঃখে আছি, মনে তিলমাত্র আনন্দ নেই। আর দুজনে একসঙ্গে বসে উপাসনাও করা হয় না।

আমি বললাম—ভাল, কাল থেকে এসো, আমরা একসঙ্গে বসে উপাসনা করবো।

তারপর আমরা একসঙ্গে বসে উপাসনা করতে লাগলাম। এইরূপ চলতে লাগল।

একদিন আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যেখানে থাক—সেখানে কি আমার পরিচিত কোন বন্ধুবান্ধবকে দেখতে পাও?

তিনি বললেন—গোসাঁইজীকে দেখি। তিনি প্রতিদিনই আমাদের কাছে আসেন। গোসাঁইজী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পরদিন স্ত্রীর সঙ্গে বিজয় এসে উপস্থিত। তারপর থেকে এখনও বিজয় প্রতিদিন আসে। তার কাছ থেকেই যে সব সংবাদ জেনেছি, তার কিছু কিছু তোমায় বলেছি। বিজয়ই আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, অনেক কিছু দেখিয়েছে। আমি এই জীবনে এই দেহে থাকতেই কত লোকান্তর দেখে এসেছি। সে-ই বঙ্কিমকে ডেকে দিয়েছে। এই দেখ আমার পাশে বসে লিখছে।' এই বলিয়া তিনি বলিলেন—'আজ অনেক বেলা হয়ে গেল, এইবার আমি উঠি। তুমিও ওঠ, আবার এস।'

আমি প্রণাম করিয়া উঠিলাম। পাশের ঘরে বিধু ছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

[চার]

বিধু শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজের* শিষ্য। তাঁহার সমাশ্রয়ণের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা যখন বহু লোক একসঙ্গে অযোধ্যায় দীক্ষালাভ করি, তখন বিধু আমাদের সঙ্গে যাইতে পারে নাই—ময়মনসিংহেই ছিল। আমরা সমাশ্রিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে বিধু একবার কলিকাতায় আসিয়াছিল। আমায় বলিল—"তোমরা তো অযোধ্যায় গিয়া সমাশ্রিত হইলে,—আর শ্রীস্বামিজী মহারাজ স্বয়ং ময়মনসিংহে আসিয়া আমাকে কৃপা করিয়া দীক্ষিত করিয়া গেলেন সেইদিনই রাত্রে—স্বপ্নে। এই বলিয়া বিধু আমায় আমাদের ইষ্টমন্ত্র, গুরুপরম্পরা ও করণীয় যাহা কিছু সবই বলিল। আর বলিল—শ্রীস্বামীজী মহারাজ বলিয়াছেন—তোমার কেবল 'তপ্তমুদ্রা'

* শ্রীশ্রীবলরাম স্বামীজী মহারাজ

ধারণ বাকী রহিল, পরে অযোধ্যায় আসিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। পরে বিধুও অযোধ্যায় গিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিল।

অনেকদিন পরে একদিন হঠাৎ ডাক্তার সেনগুপ্ত বলিলেন,—'শুনেছেন, বিধুদা মারা গেছেন? আমি এক জায়গায় রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁরা বললেন—বিধুভূষণ দত্ত, আপনাদের বন্ধু ছিলেন, আমরা তাঁর আত্মীয়। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম—ছিলেন মানে কি? তাঁরা বললেন—তিনি মারা গিয়েছেন। আমি বাড়িতে ফিরেই আপনাকে সংবাদ দিতেছি।' আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপন মনে ডাক্তার সাহেবকে বলিলাম—'তাইতো বিধু চলে গেল, তোমাকে কি আমাকে কিছুই বলে গেল না? আমরা তো চিকিৎসক, রোগী হলে তাহার আত্মীয়স্বজনেরও একটা সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।'

বহুদিন কাটিয়া গেল। প্রত্যহ মনে হইত, তাইতো বিধু কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল, জীবনটাও স্বপ্ন, সবই মিথ্যা, এত আলাপ পরিচয়, একসঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ব্যবহার। ভিন্ন বাড়ীর লোক হইলেও আমরা তো মনে মনে একই পরিবারে বাস করিতাম, এ কি হইল!

প্রতিদিন দিনান্তে বিশেষতঃ শোবার আগে বিধুর কথা মনে হইত, আর অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইত।

একদিন দেখি, শুইবামাত্র বিধু আসিয়া হাজির। মূর্ত্তি নাই তথাপি মন আশ্বস্ত, যেন বিধু আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলে, সব সত্যকে মিথ্যা করিয়া দিলে, বড়ই আশ্চর্য।

বিধুর শব্দহীন বাক্য বাহিরের কান শুনিল না, কিন্তু মনের মধ্যে যে কান ছিল সে স্পষ্টভাবে শুনিতে পাইল। বিধু বলিতেছে—আমি যে মরিয়াছি তাহা আমি জানিতাম না। তোমার বোধ হয় মনে আছে আমি বলিয়াছিলাম গুরুকুলের মত এখানে একটা আবাসিক বিদ্যালয় করিব, আশ্রমের মত। সেজন্য কাঁচড়াপাড়ায় (বর্ত্তমান কল্যাণীতে) খানিকটা জমি লইয়াছিলাম, মাঝখানে একটা দোচালা কুটীর করিয়াছিলাম। তার একপাশে পাকশালা, বাকী সবটাই গুরু শিষ্য—একসঙ্গে বাসের ভাল স্থান। আশ্রমের জমিতে অনেক গাছ লাগাই। তার মধ্যে তোমার দেওয়া গাছগুলিও ছিল। শিষ্যও কয়েকজন জুটিয়াছিল।

একদিন দেখি প্রবল জ্বর, জ্বরে অজ্ঞান অভিভূত। কয়দিন এই জ্বর ছিল জানিনা—একদিন হঠাৎ আমার মনে হইল আমার জ্বর নাই। বেশ সুস্থ সুন্দর, শরীর বড়ই হালকা, এদিক ওদিক ঘুরি, কিন্তু মনে হইল আমার শরীর নাই। সবই আছে আমার শরীর নাই, তবে কি আমার মৃত্যু হইয়াছে? এইরূপ অবস্থায় আমি তোমাদিগকে খবর দিব কি করিয়া?

তারপর আমার পরিত্যক্ত দেহের কি হইল, আমি কোথায় রহিলাম, কিছুই মনে নাই। মনে হইতে লাগিল, আমি যেন বায়ুভূত নিরাশ্রয় হইয়া উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। দেহ নাই, সুতরাং তাহাকে পোষণের জন্য অন্নপানীয়ের প্রয়োজন নাই। তথাপি অন্নপানীয়ের স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিতেছে। এইরূপে কতদিন বা কতকাল কাটিয়া গেল জানিনা। তারপর শ্রীস্বামিজী মহারাজের কথায় আমি একটা স্থানে আশ্রয় লাভ

করিয়াছি, সেটা শ্রীস্বামিজী মহারাজের এখনকার আশ্রয় বা দিব্যদেশ কিনা জানি না,—কেন না—এখানকার সম্বন্ধে আমার পরিচয় ছিল না, কাজেই কোন অভিজ্ঞতা নাই।

আমি বলিলাম—সে দেশের অবস্থা, ব্যবস্থা ও তোমার কেমন অবস্থা সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পার? উত্তরে বিধু বলিল—বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে কেন? তোমার শিক্ষা, সংস্কার, জ্ঞান, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারে না, অথচ তোমার মন কিছু তার জ্ঞানের বাহিরে রাখিতে চায় না। কাজেই আমি যা বলিব, তুমি তার একটা মনগড়া রূপ দিয়া অজ্ঞাত অজ্ঞেয়কে কিম্ভূত-কিমাকার রূপ দিয়া খাড়া করিবে, কেহ বিশ্বাস করিবে, কেহ বা করিবে না। তবে বিশ্বাস না করিবারই কথা—কেননা—মনুষ্যবুদ্ধিঃ দেবা ন জানন্তি।

বিধু চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—তুমি আমায় কখনও ডাকিও না, কোন অসুবিধাও করিও না। প্রয়োজন হইলে আমি নিজেই আসিব। আর যদি আমি তোমার আপনার জন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে দেখিবে পরজগতের কত সংবাদ আনিয়া দিয়া যাইব। স্থূলজগতের সঙ্গে সূক্ষ্মজগতের সম্বন্ধ, এঘর ওঘর বা এই দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্বন্ধ—একটা প্রত্যক্ষ অপরটা অপ্রত্যক্ষ। তুমি সে দেশে যাও নাই, যে দেশে ছয়মাস দিন আর ছয়মাস রাত্রি—সে দেশেও লোক আছে, তাহাদেরও আহার-নিদ্রা আছে, ইহা তুমি বিশ্বাস কর। আর এই দেশের—মরণের পরে মানুষ যে দেশে যায়, সে দেশের কথা বিশ্বাস করিবে না—কেন না তুমি স্থূলের উপাসক। স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম সত্য। মিথ্যা পরিত্যাগ

করিয়া সত্যের উপাসক হও।

আর একদিন হঠাৎ বিধু আসিয়া বলিল—দেখ, আমি আরও কয়েকবার তোমার কাছে আসিয়াছিলাম—কিন্তু দেহ ধারণ করিয়া নহে, কেন না তুমি আমাকে দেহধারী দেখিলে ভূত বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে,—তাহা ছাড়া দেহধারণ করিবার যোগ্যতা আমার নাই, যাহারা দেহধারণ করিয়া দেখা দেয় তাহারা কি প্রকার ইত্যাদি সংবাদও আমি রাখি না। আসিয়াছিলাম তোমার মনের মধ্যে স্মৃতিরূপে, তুমি সে স্মৃতিকে স্থান দাও নাই, বিস্মৃতির জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলে। দেখ একটা কথা বলি। মরণের পরে যে সকল আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত প্রিয় অথবা অনুগ্রহপরায়ণ মহাপুরুষগণ আসেন—তাহারা যে মূর্ত্তিতে আসেন সে মূর্ত্তি দেখা যায় না—কেবল মনের মধ্যে স্মৃতি তাঁহাদের আগমন জানাইয়া দেয় আর সেই সঙ্গে মনের মধ্যে এমন একটা ভাবের উদয় হয় যে, সেই ভাবের সঙ্গে ভাব করিয়া যদি মনে মনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উপস্থিতি স্বীকার করিয়া সেই স্মৃতির বস্তুকে স্মরণ করিতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে সেই স্মৃতিই একটি মানসী ভাবময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া তোমায় কত কথা বলিতেছে। ইহাও একপ্রকার ধ্যানযোগ। ইহাতে "শৃণোত্যকর্ণঃ"—কান না থাকিলেও তাহার কথা শোনা যায়. দেহের কান দিয়া নহে, মনের কান দিয়া, যে কান দেহত্যাগের সময় মনের সঙ্গে চলিয়া যায়। তুমি বোধ হয় যোগদর্শন বা যোগী মহাপুরুষগণের কাছে ইহার সন্ধান পাইবে। এখানে আমার বক্তব্য—মনের খেয়ালে সব কিছু উড়াইয়া দিও না, "শ্রীহরিঃ শরণম্ বা শ্রীগুরুঃ শরণম্"—বলিলে তাঁহারা আসেন কি না বলিতে পার? হিন্দুর

ধর্মশাস্ত্রে আছে—"স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম্"—অবশ্য এখনকার কালে নয়, আগেকার কালে হিন্দুমাত্রেই যাত্রাকালে শ্রীহরিকে বা দুর্গা বা কালীকে স্মরণ করিত। তুমি বলিতে পার—তাহার ফলে তাহাদের কার্যসিদ্ধি বা পথের আপদ বিপদ কাটিয়া যাইত কি না? হিন্দুর লোকাচারও ধর্ম।

দেখ, এখানে আসিয়া স্বামীজী মহারাজের কৃপায় মনে হয়, ভগবৎ-কৈঙ্কর্য সহজ নয়। নরোত্তম দাস বলিয়াছিলেন কোন এক প্রসঙ্গে, "জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনারে খাইয়াছে।" সত্যই তাই, আপনার আমিত্ব থাকিতে ভগবৎ-কৈঙ্কর্য করা চলে না, অথচ আমার সব কিছু দিয়া অচিৎবৎ পরতন্ত্র হইয়া সব আছে—কিছুই নাই, এমন অবস্থা হইলে ভগবৎ-কৈঙ্কর্য করা যায় অথচ কবীরের মত পদে পদে স্মরণ করিতে হয়—

"ম্যায় গুলাম ম্যায় গুলাম হো তেরা।
তু দিবান্ তু দিবান্ তু দিবান্ হো মেরা।"

আর ন'কাকাকেও (শ্রীউপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত) আপন মনে গান করিতে শুনিতাম—

"তুমি প্রভু আমি দাস, শ্রীচরণে রেখো নাথ
শ্রীচরণে রেখো প্রভু শ্রীচরণে রেখো।"

আমার মনে হয় কিঙ্কর যদি একবার প্রভুকে ভুলে যায়, তা হলে তার আর কৈঙ্কর্য করা চলে না। তখন সে অজ্ঞাতসারে আপনিই প্রভু হইয়া বসে। যেমন আমি সমাশ্রিত হওয়ার পরে আপন মনেই কিঙ্কর হইয়া বসিয়াছিলাম। যাহা মনে হইত সবই তাঁহার বলিয়া মনে হইত, যেন আমার ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা বা

তাঁরই ইচ্ছা আমার ইচ্ছা। তাই নিজের ইচ্ছা আশ্রয় করিয়া বিদ্যালয় করিতে গিয়াছিলাম, একবারও অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই।

দেখ, মনে হয়, তুমি একবার ব্রাহ্ম সমাজের লেকচার শুনিয়া আসিয়া বলিয়াছিলে—শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ধর্ম কি প্রচার করিলেই হয়। দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাই একটা সর্বধর্ম সমন্বয় করিবার জন্য ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন—আর কৌপীনমাত্রসার শ্রীচৈতন্যও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এখন দেখ বাদশার ধর্ম বাদশার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, আর শ্রীচৈতন্যের ধর্ম আজও চলিতেছে, প্রচার করিতে হয় না, কবে চৈতন্যদেব চলিয়া গিয়াছেন।

বিধুর আগমন ও তিরোধান দুই-ই দুর্বোধ্য। তবে মন থেকে সে ভাবের অভাব হইলে মনে হয় বিধু এখনকার মত চলিয়া গিয়াছে। আবার কোন্ দিন কোন্ সময় দেখা হইবে বলা যায় না। এইজন্য মনে হয়, সেখানে বোধ হয় দিনরাত্রি নাই—আহার নিদ্রাও নাই—সে সব বোধ হয় এই জগতের।

[পাঁচ]

মানুষের শরীরের মধ্যে আর একটি অতীন্দ্রিয় মানুষ বাস করে, তাহার নাম আত্মা। আত্মা মনের সহিত যুক্ত হইয়া যখন মনুষ্যদেহ ধারণ করে, তখন সে মানুষ নামে পরিচিত হয়। আত্মার মৃত্যু বা মরণ নাই, আছে দেহ ত্যাগ, যাহাকে বলে মানুষের মৃত্যু বা মরণ। এইজন্য মনুষ্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"

অর্থাৎ—হে মানুষ, মরণের জন্য চিন্তিত হও কেন? তুমি যে অমৃতের সন্তান, অমর।

মানুষ বা আত্মা দেহত্যাগ করিলেও মনের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না, সেজন্য মনের প্রবৃত্তি বশে তাহাকে ভূত-প্রেত হইতে হয়, অথবা দেহত্যাগের পর বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ হইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ চলিতে থাকে, ইহারই নাম সংসরণ বা সংসার। এই সংসার হইতে মুক্তির জন্য উপনিষৎ বলিয়াছেন,

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"
"বন্ধঃ স্যাৎ বিষয়াসক্তিঃ মুক্তি র্নির্বিষয়ং মনঃ"

মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ মন। মনে যতদিন বাসনা কামনা থাকে, ততদিন সে বদ্ধ, আর যখন সেই বাসনা কামনার নিবৃত্তি ঘটে তখন সে মুক্ত, এমন কি দেহত্যাগ না করিয়াও লোকে বলে,— 'মরণটা হলে বাঁচি।' কিন্তু জানে না, সে বাঁচে কি মরে।

মনের তিনটি গুণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ। সত্ত্ব জ্ঞানের আধার, আর রজঃ ও তমঃ সকল দোষের আকর — বাসনা কামনার মূল। এই রজঃ ও তমোগুণ হইতেই বাসনা কামনার উৎপত্তি। কিন্তু মনের সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে বাসনা কামনার নিবৃত্তি ঘটে। আর যতদিন তাহা না হয় ততদিন—

"ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নিষ্কৃতিম্"

জন্ম হইতে জন্ম, আবার জন্ম। এইরূপ চলিতে থাকে, নিষ্কৃতি ঘটে না। কিন্তু—

"সৎকর্মপরিপাকাৎ তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ
প্রাপ্ততীরতটচ্ছায়াং বিশ্রামন্তি যথা সুখম্ ॥"

নদীর তরঙ্গমালায় উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত পিপীলিকা যেমন কোন মহানুভব কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া তটস্থ তরুতলে আশ্রয় লাভ করিলে তাহার সকল দুঃখের অবসান ঘটে, তেমনি যাহারা সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সৎকর্ম করিয়া জীবন যাপন করে, ভগবদারাধনা ব্যতীত জীবনের কর্ত্তব্য কিছু নাই বলিয়া মনে করে, তাহাদের সেই সাধুসঙ্গ ও সৎকর্মের ফলে করুণানিধি আসিয়া সংসারের যাতায়াত ভীতি হইতে নিষ্কৃতি দিয়া সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটাইয়া চিরবিশ্রাম চিরশান্তি প্রদান করেন, নতুবা বাসনা কামনার বশে আবার আসিতে হয়, আসিতে না পারিলে যাতনাময় দেহ ধারণ করিয়া ভূত-প্রেত হইয়া দুঃখভোগ করিতে হয়। এই দুঃখ কষ্টের বন্ধনময় ভূত ও প্রেতভাব হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য সমাধান হইতেছে শ্রীশ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা—এই কথা মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম এবং কার্যতঃ তাঁহার পরিচয়ও আমি পাইয়াছিলাম। সেজন্য অনেক স্থলে আমি গয়ায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়া সুফল পাইয়াছি।

এখন, মানুষ বা আত্মার দেহত্যাগ হইলেও মনের বন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে না এবং সেই মনের মধ্যে যদি সৎ সংকল্প থাকে, তাহা কি প্রকারে কার্যে পরিণত হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হইতেছে।

বহু দিনের কথা। তখন স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বরাগ

প্রারম্ভ। একদিন একটি লোক আসিয়া একখানি চিঠি দিল, লিখিয়াছেন—শশীদা, শশিভূষণ রায়চৌধুরী। নিবাস সোদপুর ষ্টেশনের পূর্বদিকে কয়েক মাইল দূরে 'তেঘরা' নামক গ্রামে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ঠাকুর বাক্য দিয়াছিলেন সৎকথা বলিবার জন্য, তাহা পারি নাই। ঠাকুর এখন সেই বাক্য বন্ধ করিয়া দিতে বসিয়াছেন। তুমি আসিবে, কয়েকটা কথা বলিব—বোধ হয় ইহা আমার শেষ কথা।"

শশীদার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—তিনি অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন, অত্যন্ত সমাদরও করিতেন। তিনি বি, এ, পাশ করার পর গৃহশিক্ষকতা করিয়া অর্থার্জন করিতেন এবং সেই অর্জিত অর্থের সমস্তই গ্রামস্থ শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে দান করিতেন, সেজন্য ভিক্ষাও করিতেন। তাঁহার স্বগ্রামের এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী গ্রামের কামার কুমার চাষী প্রভৃতি যাহারা সমস্ত দিন স্বকর্মের দ্বারা জীবিকার্জন ও সংসার প্রতিপালন করিত, তাহারা সন্ধ্যায় শশীদার শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত।

এইরূপে কিছুকাল চলিবার পর যখন স্বদেশী আন্দোলনের মহা সমারম্ভ, বৃটিশরাজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিবিধ চেষ্টায় বিব্রত, কুত্রাপি দেশের কোন ব্যক্তিকে দেশের কোন কাজে ব্যাপৃত দেখিলেই তাহার স্বাধীনতা হরণের চেষ্টাই যখন একমাত্র রাজকর্ম, এমন সময়ে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় শশীদাকে রোগে জীর্ণশীর্ণ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত দেখিয়া দৌলতপুর কলেজের ছাত্রী-আবাসের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিয়া একটি নির্দিষ্ট কক্ষ ও আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজসরকার তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়া অন্যত্র পাঠাইয়া দিল।

অন্তরীণ অবস্থায় থাকাকালে শশীদার রোগের বৃদ্ধি হইল—মুখে রক্ত উঠিতে লাগিল, জ্বরও আসিয়া দেখা দিল। রাজসরকার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিয়া শশীদাকে মুক্তি দিল। শশীদা সেখান হইতে আসিয়া ডাঃ বিজিতেন্দ্র বসুর মেসে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। বিজিতেন্দ্রবাবু তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। রায় বাহাদুর ডাঃ গোপাল চট্টোপাধ্যায় শশীদার বন্ধু, একই দেশে বাড়ী। তিনি আসিয়া শশীদার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন—রোগ কিন্তু না রোগী না ডাক্তার কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বাড়িয়াই চলিল। শশীদা আমায় একদিন বলিলেন, 'গোপাল বলেছে, শশীদা তুমি সারবেও না, মরবেও না, আমি আর ডাক্তারী-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারছি না।'

এই অবস্থায় কিছুদিন পরে শশীদা স্বগ্রাম 'তেঘরে' চলিয়া গেলেন। তার কিছুদিন পরে আমায় লিখিলেন,—'ঠাকুরের দেওয়া বাক্যের অপব্যবহার করেছি, শেষ কথা বলিয়া যাইব, তুমি আসিবে।'

আমি তাঁহার আদেশমত 'তেঘরা' গিয়া তাঁহাকে দেখিলাম—শরীরে কিছুই নাই, মনে কিন্তু সবই আছে—সেখানে কোন রোগ নাই, কাতরতা নাই, পরম শান্ত সুন্দর নির্মল।

শশীদা বলিলেন—'অবস্থা তো দেখিসনি, এখন কি করি বল্, তোর মত কি ?'

আমি বলিলাম—'শশীদা, তুমি যাও, আর এই রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে কি হবে, দেহটা বদ্‌লে আবার নতুন দেহ নিয়ে এসো, কাজের সুবিধে হবে।'

শশীদা বলিলেন—'আমার কাজ ? জানিস্ তো আমার সঙ্কল্প কি, এখনো যে তার সবই বাকী—সে-সব কে করবে ?'

আমি বলিলাম—'শশীদা তোমার কাজ করবার লোকের অভাব হবে না, অনেক লোক এসেছে, যদি কেউ তোমার কাজ না করে তো মনে কোর ঠাকুরের ইচ্ছা নয়। এই পর্যন্ত তোমার দায় ছিল—বাকী যার কাজ সেই করবে।'

শশীদা বলিলেন—'সব তো বুঝলাম, মন যে মানে না, তার তো মরণ নাই, দেহের সঙ্গে তাকেও তো ফেলে যেতে পারবো না, এখন উপায় কী ? এই মন নিয়েই কি যেতে হবে ?'

আরও অনেক কথাই হইল। শশীদা বলিলেন—'তা হলে বল্ আজকেই চলে যাই, আর থেকে কাজ কি, যার কাজ সেই দেখবে, তার কি লোকের অভাব আছে ?' এই বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোর কাছে কি আছে ?' আমি বলিলাম 'ট্রেন ভাড়া ছাড়া আট আনা পয়সা আছে।' শশীদা বলিলেন—'তাই দে আমাকে, আমার যে তাও নেই।'

শশীদার নিকটে বিদায় লইলাম, তিনিও বিদায় লইলেন—চিরবিদায়।

শশীদার কাছ হইতে বিদায় লইয়া ফিরিতেছি—পথে একটা

গাছতলায় দেখিলাম অধ্যাপক সুনীল আচার্য, অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, বিনয় সরকার, যতীন চাটুয্যে প্রভৃতি। তাঁহারা আমায় দেখিয়া শশীদার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—সকল কথাও শুনিলেন। বলিলেন—বিদায় দেওয়াটা ভাল হয় নাই। শশীদা কিন্তু সেই রাত্রে চলিয়া গিয়াছিলেন, আর ফেরেন নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে একদিন রাত্রিতে আসিয়া বলিলেন—'একবার দেখবিনে? যার কাজ সে কেমন করছে।' স্বপনে দেখা শশীদা, তাঁর কথা—সে-ও তো স্বপন?—মনের খেয়াল নয়তো?

অনেক দিন হইল—দিন নয়, কত বৎসর। একদিন 'তেঘরে' থেকে একজন লোক আসিয়া উপস্থিত, সঙ্গে মোটর গাড়ী। তিনি বলিলেন, 'বোধ হয় চিঠি পাইয়াছেন—আজ আমাদের শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব, আপনাকে সভাপতি করা হইয়াছে, গাড়ী আনিয়াছি—পথে সুনীল আচার্য মহাশয়কেও লইয়া যাইব।'

'তেঘরে' গিয়া দেখিলাম শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পাকা ঘর, লাইব্রেরী, হাসপাতাল চিকিৎসালয়, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। একস্থানে একটা খুব বড় বাঁধান বেদী—যেখানে শশীদা গ্রামের লোকদিগকে লইয়া সদালাপ করিতেন। অপূর্ব ব্যবস্থা; এ ব্যবস্থা কে করিল?

একজন প্রাচীন কবি লিখিয়া গিয়াছেন, "ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে"—মহৎগণের সঙ্কল্পিত কার্যের সিদ্ধি তাঁহাদের ইচ্ছাতেই হয়, কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

সাধুমহাত্মাগণের সঙ্কল্প বা ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকে না—ইহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন, কেননা তাঁহাদের দেহত্যাগ

মৃত্যু নহে, তাঁহারা অমর—তাঁহাদের ইচ্ছাও অমর এবং তাহা কখনও অপূর্ণ থাকে না।

আমি শশাদার সঙ্কল্পকে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মনে হইতে লাগিল—

'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে নিয়ে যায় কোথা কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে—এনেছে তোমার দুয়ারে।'

[ছয়]

মরণে আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না। ইহাই ভারতীয় হিন্দুগণের সাধারণ ধারণা। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী পণ্ডিত, তাঁহাদের ধারণা, মরণের পরেও আত্মার যতদিন এই জগতের ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে ততদিন তাহাকে এই জগতে ফিরিয়া আসিতেই হয়। তবে সেই আত্মা যে-দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে সে-দেহে আর প্রবেশ করে না, করিতেও পারে না, সেই জন্য আবার নূতন দেহ ধারণ করিতে হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে যোগী-ঋষিগণ যোগবলে যে দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন সেই দেহেই অথবা অপর দেহেই আবার আসিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেন।

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্বেদ—বলেন,—'দেশান্তরগতিঃ স্বপ্নে'—আত্মার আছে, অর্থাৎ আত্মা নিদ্রিত অবস্থায় দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দেশান্তরে যাইতে পারে এবং ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই দেহেই প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা সকলের হইতে শুনি নাই, নিজেরও হইতে দেখি নাই। তবে কাহারও কাহারও হইতে পারে এই বিশ্বাস আমার আছে। প্রমাণস্বরূপ দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

একজন হাইকোর্টের উকিল, এস. পি. চ্যাটার্জি, নিবাস—মনোহর পুকুর রোড, কালীঘাট। তিনি বলিলেন, 'মহাশয়, একদিন আমি রাত্রিতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। পাশে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সকলেই নিদ্রিত। আমি সেই অবস্থায় সুপ্ত দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য এক দেশে চলিয়া গেলাম—যেখানে আমি কোন দিনই যাই নাই। স্থান—সমুদ্রতীর, আকাশ-ছোঁওয়া প্রকাণ্ড পাথরের মন্দির, ভিতরে তিনটী দেববিগ্রহ। দেখিয়া মনে হইল জগন্নাথের মন্দির। স্থানটি তাহা হইলে পুরীই হইবে। তারপর সেখানে আরও কত মন্দির এবং দর্শনীয় বস্তু সকল দেখিলাম। পরে সেই অবস্থাতে বাড়ীতে ফিরিলাম। শরীর তখন এমনই লঘু ও সূক্ষ্ম যে, সেই সকল দেখিতে এবং ফিরিয়া আসিতেও আমার বেশীক্ষণ সময় লাগিল না বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া এক মহা ফ্যাসাদে পড়িলাম, কিছুতেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। আমি ছাড়া আমার দেহ, সুপ্ত স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি—সবই রহিয়াছে কিন্তু আমি এ সকল হইতে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছে না। বড়ই কান্না পাইতে লাগিল। সে কান্না এখনও আমার সেই অবস্থার কথা মনে হইলে পায়।

তারপর হঠাৎ আমি দেখি—আমার দেহের মধ্যে আমি প্রবেশ করিয়াছি। কি আনন্দ! আমার দেহে আমি আছি, শুধু আমি নয়—দেহ ও আমি এক—দেহই আমি।

পরদিন সকালে উঠিয়া পিসীমাকে সব বলিলাম। তিনি বলিলেন,—'সে তো পুরী, যা বলছিস সবই সত্যি—সবই আমার দেখা।'

আর এক অদ্ভুত ঘটনা — 'না মরিয়া মরা, বা মরিয়া বাঁচা'। আমি তখন চিকিৎসক। রোগিণীর রোগ—মৃত্যুশঙ্কা। মরিতে ইচ্ছা নাই তবু মরিতেই হইবে—কোন এক বিদেহী আত্মার অনুরোধে।

রোগিণী থাকিত সালকিয়ায়; পুত্র হুগলী ব্যাঙ্কে চাকরী করিত। স্বামী আছে, ছেলে মেয়ে আছে—সাজান সংসার। কাজেই রোগিণীর মরিবার ইচ্ছাও নাই, অথচ তাহাকে মরিতেই হইবে অপরের ইচ্ছায়—যাহাকে রোগিণী দেখিতে পায় অপর কেহ দেখিতে পায় না। এই বাঁচা মরার দোটানায় পড়িয়া রোগিণীর বিবিধ প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ দেখা দিয়াছে। বহু-প্রকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা করা হইয়াছে, কিছুতেই কিছুই হয় নাই।

'কেন তোমায় অনিচ্ছায় মরিতে হইবে?' জিজ্ঞাসার উত্তরে রোগিণী আমায় বলিল, "বাবা, আমার বাড়ী মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলার মাঝখানে এক পাড়াগাঁয়ে। একটি ব্রাহ্মণের ছেলের পৈতার সময় আমি তাহাকে প্রথমে ভিক্ষা দিয়া 'ভিক্ষা-মা' হলাম। কিছুকাল পরে ছেলেটি মারা গেল, কিন্তু মায়ের টান আর ছেলের টান, যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল, বরং বেশী হ'ল। একদিন সেই ছেলে এসে বলল — আমি কি একলাই থাকবো, তুই আসবিনা রে।

বাবা, সেই ছেলেকে আমি দেখি, কথা শুনি, আর কেউ দেখে না—সেজন্য আমার কথায় বিশ্বাসও কেহ করে না। আর আমিও তার মায়া কাটাতে পারি না। এখন বলতে পারো বাবা—আমি কি করি?"

আমি রোগিণীকে একটি 'মূল' ধারণ করিতে দিলাম। মূলটি আয়ুর্বেদোক্ত ভেষজ। তার কয়েকদিন পরে লোকমুখে শুনিলাম, রোগিণী মূলটি ধারণ করিয়াছিল, তথাপি একদিন হঠাৎ তাহার আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে।

মৃত্যু সংবাদের বেশ কিছুদিন পরে, বোধ হয় মাস ২।৩ পরে, একদিন রোগিণী বেশ সুস্থ-সবল দেহে পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আমারই নিকট উপস্থিত। আমি নির্বাক্ বিস্মিত।

রোগিণী আমায় প্রণাম করিয়া বলিল, 'বাবা, আমি তো মরিলাম—আবার বাঁচিলামও'। তখন তাহার ছেলে বলিতে লাগিল, 'কবিরাজমশায়! আমার মার কোন রোগ-বালাই নাই, বসিয়া থাকিতে থাকিতে মারা গেলেন। বাড়ীশুদ্ধ কান্নাকাটি উঠিল—পাড়ার লোক জড় হইল। আমরা মার সৎকারের জন্য লোকজন ডাকিতে গেলাম। তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। খাটিয়া, ফুলের মালা,—সব কিছু লইয়া বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, মা আমার মরেন নাই। উঠিয়া বসিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতেছেন।'

তখন তাহার মা বলিতে লাগিল,—'বাবা, মরণটা তো হল। দু'জন লোক আমায় নিয়ে গেল। সঙ্গে সেই ভিক্ষাপুত্তুর—এ ছেলে নয়। তারা আমায় নিয়ে গিয়ে যেখানে হাজির করল সেখানে চারিদিকে জঙ্গল আর পাহাড়ের পর পাহাড়, মাঝখানে একটা মন্দির। মন্দিরের মধ্যে একজন খুব বুড়ো সন্ন্যাসী। যারা আমায় নিয়ে গিয়েছিল, তারা সেই সন্ন্যাসীকে বলল, বাবা, এই তো নিয়ে এসেছি, এখন যাতে ফিরে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা আপনি করুন।

সন্ন্যাসীঠাকুর তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—করেছিস কি? দেখগে ওর হাতে কি একটা 'শেকড়' বাঁধা আছে। তারপর আমি আবার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এখন আমার আর কোন রোগ নাই। আমার সেই ভিক্ষেপুত্তুর আমার সঙ্গে থাকে, কিন্তু যেতে বলে না। এখন আমরা মায়ে-পোয়ে থাকি,—বেশ আনন্দে। সে-ছেলে আমার কত কাজ করে, কিন্তু এ-ছেলেরা তা দেখে না, বিশ্বাসও করে না।

তখন রোগিণীর সেই সশরীরী ছেলে যে সঙ্গে আসিয়াছিল সে বলিল—'মা আমাদের বাড়ীতে যেখানে বসে পূজো করেন, সে একটা বেলতলা! কত লোক এসে সেই বেলতলার মাটি নিয়ে গিয়ে যাদের রোগ কোন চিকিৎসাতেই সারে না, তাদের গায়ে মাখিয়ে দেয়, সব রোগ সেরে যায়। মাটি নিয়ে নিয়ে বেলতলাটা 'খাল' করে দিয়েছে।'

আয়ুর্বেদে আছে—সহদেবার মূল মাথার চুলে বাঁধিয়া রাখিলে চাতুর্থক জ্বর নিরাময় হয়। চাতুর্থক জ্বর—চার দিনের পালা জ্বর। আর চাতুর্থক জ্বর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"কেচিদ্ ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম্"। অর্থাৎ চাতুর্থক জ্বরকে কেহ কেহ ভৌতিক জ্বর বলেন। আমি ভূত জানি না, ভূতে চাতুর্থক করে কিনা তাহাও জানি না। কেবল শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশ অনুমানে প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

আয়ুর্বেদে আছে

'অতীন্দ্রিয়ানসংভেদ্যান্ ভাবান্ যে দিব্যচক্ষুষা পশ্যন্তি
বচনং তেষাং নানুমানেন বাধতে'।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের বাহিরে, জ্ঞানেরও বাহিরে যে সকল ভাব, যাহাদিগকে মহর্ষিগণ দিব্যচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, সে সকল কখনও যুক্তি তর্ক অনুমানের দ্বারা জানিতে পারা যায় না। তাহার প্রমাণ এই প্রসঙ্গ হইতে বেশ জানা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-কথা বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তারগণ বিশ্বাস করেন না; আর 'যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ লোকস্তদনুবর্ত্তেত' এই ন্যায়ানুসারে বর্ত্তমানকালের অনেক কবিরাজও তদনুসারে চলিয়া থাকেন। জড়বিজ্ঞানে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, অথচ দেহের আত্মার অস্তিত্বের জন্যই শরীর এবং মানস-রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন, নতুবা আত্মসংযোগহীন অচেতন মৃতদেহের চিকিৎসার কোন প্রয়োজনই হয় না, এ কথা সর্ব্বজনস্বীকৃত। তথাপি পাশ্চাত্য-মতবিদ্ অনাত্মজ্ঞ ডাক্তারগণ বলেন—'আমাদের ডাক্তারী বৈজ্ঞানিক, কবিরাজী অবৈজ্ঞানিক। অথচ এই অবৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ভারতীয় যাবতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক 'শাস্ত্র বা গ্রন্থ। সেজন্য প্রাচীনকালে সকল দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত—নতুবা আয়ুর্ব্বেদের তত্ত্ব ও তথ্য অবিজ্ঞাতই রহিয়া যাইত। আর বর্ত্তমান সময়ে?

[সাত]

মানুষ মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গেলেও, তাহার পূর্ব দেহের প্রতি এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদির সহিত একটা অদৃশ্য সম্বন্ধবন্ধন থাকিয়া যায়। সেই বন্ধনসূত্র দ্বারা যে চলিয়া গিয়াছে তাহার সহিত সংযোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। সেইজন্য বৌদ্ধ

সন্ন্যাসী বা বুদ্ধ ভক্তগণ বুদ্ধদেবের দৈহিক সম্পত্তি—দণ্ড কেশ চিতাভস্ম প্রভৃতি পরম ভক্তিসহকারে পূজা অর্চনা করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবগণেরও মধ্যে দেখা যায়, তাঁহারা গুরুদেবের পদাঙ্কিত চেলখণ্ড, ব্যবহৃত পাদুকা প্রভৃতি গুরুবদজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।

মানুষ দেহত্যাগের পরেও যে প্রাক্তন দেহের প্রতি মমত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না, তাহার একটি বাস্তব ঘটনা বিবৃত হইতেছে।

বহুদিনের কথা। বর্দ্ধমানের প্রখ্যাত সরকারী উকীল রায়বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ মিত্র মহোদয় একবার বলিয়াছিলেন—"আমার বড় মেয়েটির মৃত্যু হইলে, মৃতদেহ এখানে বাঁকা নদীর তীরে দাহ করিয়া কিছু চিতাভস্ম একটি মৃত্তিকাপাত্রে সযত্নে রাখা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য — ত্রিবেণীসঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া হইবে। চিতাভস্মটির আধার আমার একটি আলমারীর মধ্যে ছিল। আমি প্রত্যহ তাহা দেখিতাম, সমস্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিত। এইরূপে একটা মানসপ্রত্যক্ষ আমার হইত, ফলে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ বা সংযোগসূত্র আমাদের মধ্যে ছিল।

এই সময়ে একজন ভক্ত গায়ক আমার নিকট থাকিতেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত। তাঁহার ভক্তিমূলক গান—

বারে বারে যে দুখ দিয়েছ, দিতেছ তারা,
দুঃখ নয় সে দয়া তব, জেনেছি মা দুখহরা।

প্রভৃতি শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। এই রকম বহু গান তাঁহার স্বরচিত ছিল, তাহা ছাড়াও ভক্ত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতির গান তিনি তন্ময় হইয়া গাহিতেন, শুনিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতাম।

একদিন রামলালবাবু আমায় বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার

আলমারীতে যে কন্যাটীর চিতাভস্ম রাখিয়াছেন, সেটীকে ত্রিবেণী-সঙ্গমে বিসর্জন দিলে ভাল হয়, কেননা—আপনার কন্যার বিদেহী আত্মা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আসিয়া আমায় অনুরোধ করে—বাবাকে বলিয়া ভস্মটীর ব্যবস্থা করিয়া দিলে আমার এখানকার আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে, আমি এখন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও মনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।'

পরবর্ত্তীকালে স্বর্গীয় দেবেন্দ্রবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার একবার কর্মসূত্রে পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার মুখেও আমি এই কথা সত্য বলিয়া শুনিয়াছিলাম। গিরীনবাবু কলিকাতা বুক কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী।

সাধারণ লোকমাত্রেই প্রত্যক্ষের উপাসক। তাহারা প্রত্যক্ষের মধ্যে যে একজন মরণহীন অপ্রত্যক্ষ মানুষ থাকে তাহা জানে না, যেজন্য মনুষ্যরূপে অবস্থিত আত্মারও দেহের সঙ্গে মৃত্যু ঘটে, সবই চলিয়া গেল, মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। কিন্তু প্রাচীন-কালের ভারতীয় হিন্দুমাত্রের এরূপ ধারণা ছিল না বলিয়া মনে হয়। সেজন্য তাহারা মৃত্যুর পরে বিদেহী আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির দ্বারা মানসতৃপ্তিসাধনে কদাচ অন্যথা করিত না, কেননা—আত্মা বা মৃত ব্যক্তির দেহের বিনাশ ঘটিলেও মনের বিনাশ ঘটে না, আর মনও সহসা এই সংসারে ভোগ্যবস্তু সকলের ভোগ কামনা হইতে মুক্ত হয় না। সেজন্য তাহাকে কামনাবাসনার বশে পুনঃ পুনঃ এই জগতে আসিয়া বিবিধপ্রকার দেহ ধারণ করিয়া জাগতিক সুখ দুঃখ সকল ভোগ করিতে হয়, সুতরাং মানুষ মরিয়াও মরে না। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"জাতস্য হি ধ্রুবো

মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" ইহা অপরিহার্য। এইজন্যই প্রাচীনকালের হিন্দুমাত্রেই ভগবদারাধনার দ্বারা জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিত।

মহর্ষি আত্রেয় প্রত্যক্ষবাদিগণকে নাস্তিক মনে করিতেন। সেজন্য তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"বুদ্ধিমান্ নাস্তিক্যং জহ্যাৎ, স্বল্পং প্রত্যক্ষম্ অনল্পমপ্রত্যক্ষমস্তি।" অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রের উচিত প্রত্যক্ষকেই একমাত্র অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করা। কেননা প্রত্যক্ষ স্বল্প, অপ্রত্যক্ষ অনল্প অসীম, সীমার দ্বারা তাহার অন্ত করা যায় না। যেমন, দেখা যায়—বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের উপাসক বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' বা অঙ্গুলির ছাপ। ইহা অপ্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে বা অপরাধীকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতে পারে, এমন কি তীব্র ঘ্রাণশক্তিনিপুণ সাধারণ জীব কুকুরও অপরাধীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া অপ্রত্যক্ষে অবস্থিত অপরাধীকেও ধরাইয়া দেয়। এই সকল দেখিয়া মনে হয় মানুষ মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করিলেও মনকে ত্যাগ করিতে পারে না এবং মনের মধ্যে অবস্থিত স্মৃতি ও সংস্কারকেও ত্যাগ করিতে পারে না, যাহার জন্য মানুষে মানুষে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তির কত ভেদ কত বৈচিত্র্য। বাপ মা একই, অথচ কেহ সাধু কেহ অসাধু। মানুষ যখন শরীর ত্যাগ করিলেও মনকে ত্যাগ করিতে পারে না, তখন তাহার মনের মধ্যে যে সকল জন্মান্তরীণ সংস্কার চিরনিবদ্ধ তাহা একান্তভাবে ত্যাগ করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আমি মরণের পরে মানুষের কি অবস্থা হয়, সে সকল অনুসন্ধানকালে বিশেষভাবে দেখিতে পাইয়াছি। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ

মানুষেরই এখন ধারণা যে, আমি যাহা জানি না, তাহা হয় না, হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষের যুগেও যাহা হইত না তাহা হইতেছে, যাহা জানিতাম না তাহা জানিতেছি। আর অপ্রত্যক্ষ অধ্যাত্মদর্শনে যাহা দেখা যায়—সে-সব কি অমূলক ? মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

"অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ ভাবান্ যে দিব্যচক্ষুষা।
পশ্যন্তি বচনং তেষাং নানুমানেন বাধতে॥"

[আট]

একদিন নিশ্চিন্ত মনে পূজা করিতে বসিয়াছি। পূজায় ভগবৎ-সম্বন্ধ না হইলেও কতকগুলি অনাবশ্যক চিন্তার নিষ্কৃতি ঘটে, সেজন্য মনে একটা ভাবান্তর ঘটে। এই সময়ে দেখি—

একটি ২৩।২৪ বৎসরের বালক মুণ্ডিত মস্তকে একগুচ্ছ কেশযুক্ত শিখা, কপালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তিলক, সর্বাঙ্গে—'নিতাই-গৌর-রাধেশ্যাম' ছাপ। গলায় খুব মোটা একগাছি তুলসী মালা। দেখিয়া এমনি বিস্মিত হইলাম যে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—আমি কে বা কি, আর এই বালকটিই বা কে ?

বালকটি বলিল—'চিনিতে পারেন ?'

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম—'মনে হয় কোথাও যেন দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক চিনিতে পারি নাই।'

বালক বলিল—"আমি সেই, যাহাকে আপনি পাইকপাড়ায় চিকিৎসা করিয়াছিলেন দুরারোগ্য রোগে, অন্তিম অবস্থায়। কাজেই

রোগজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এ দেহ আমার মরণের পর নবীন দেহ—গুরুকৃপালব্ধ। আপনি জানেন না আমি রামদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য। আমার একটা প্রার্থনা আমার মাকে বলিবেন। তিনি আপনার কাছে প্রায়ই আসেন, আমার মৃত্যুর জন্য শোক করেন। তাঁহাকে বলিবেন—আমার মৃত্যু হয় নাই, আমি নূতন দেহ পাইয়াছি। কিন্তু এ দেহও বোধ হয় আমার থাকিবে না। আবার স্থূল দেহ ধারণ করিয়া জগতে আসিতে হইবে, কেননা মায়ের কান্নায় আমি স্থির থাকিতে পারি না, আর আমার মায়ের প্রতি টান যায় নাই। একবার যাঁহাকে মা বলিয়াছি, তেইশটা বছর যাঁহার স্নেহ যত্ন আদরে প্রতিপালিত হইয়াছি, তাঁহাকে ভুলিতে পারি নাই। কিন্তু গুরুর আদেশ ব্যতীত যাইতে পারি না। তবে যদি গুরুর কৃপা হয় তো আবার সেই মায়েরই কাছে যাইব। এখন তাঁহার কান্নায় আমার মন চঞ্চল হয়—গুরুগৃহে বাস বিফল হয়।”

আশ্চর্যের বিষয়—আমার জাগ্রৎ স্বপ্ন কোথায় মিলাইয়া গেল। বালকটি নাই। আমায় মন আমাতে ফিরিয়া আসিয়াছে, মনে হইল আমি যেন অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছি।

কয়েক দিন পরে পুত্রহারা জননী (কর্পোরেশনের কর্মী ধর্মদাস মজুমদারের স্ত্রী) শোকসন্তপ্ত চিত্তে আসিয়া উপস্থিত। আমি বলিলাম—“মা, তুমি কাঁদিও না, তোমার ছেলে আবার তোমারই কাছে আসিবে। এখন সে গুরুর কাছে আছে, কাঁদিলে তাহার কষ্ট হয়”—এইমাত্র বলিলাম, আর কিছু নয়। আশ্চর্য, তাহার মা বিশ্বাস করিল। কে যেন তাঁহার চিত্তে বিশ্বাস

আনিয়া দিল। এতদিন তত্ত্ব কথার উপদেশে যাহা হয় নাই, আজ তাহাই হইল। মা আর ছেলের সম্বন্ধে কোন কথাই না বলিয়া অন্য কথায় খানিকক্ষণ কাটাইয়া চলিয়া গেল। আমিও বিস্মিত হইলাম—যে মা ছেলের কথা ছাড়া কিছুই বলিত না, সেই মা-ই আজ নিশ্চিন্ত—আশ্বস্ত। কিসে কি হয় কে জানে ?

বেশ কিছুদিন পরে—একদিন পুত্রহারা জননী প্রসন্ন চিত্তে হাতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"বাবা, আমার ছেলে ফিরেছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম — "মা, তোমার কি আবার সন্তান হইয়াছে ?"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"বাবা, আমার আর সন্তান হইবার বয়স নাই, ছেলে এসেছে আমার মেয়ের পেটে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে-ছেলে যে তোমারই, তুমি জানিলে কি করিয়া ?"

তিনি বলিলেন—"বাবা, গরুতে মরা বাছুরের চামড়ার গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে এ আমারই বাছুর, আর আমি আমার ছেলেকে দেখে চিনতে পারব না—আমার ছেলে কিনা ? মন যে সব বলে দেয়। তার রকম-সকম হাব-ভাব সবই যে আমার চেনা। সে যখন জন্মেছিল তখন থেকে তেইশ বছর পর্যন্ত আমি তাহাকে খাইয়েছি, পরিয়েছি, মানুষ করেছি—সবই যে আমার চেনা। আশ্চর্য! ছেলেটি আমা ছাড়া থাকে না, মা নিলেই কেঁদে আকুল হয়, আমি নিলেই চুপ। তার মা কেবল পেটে ধরেছে মাত্র।"

ভারত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পীঠস্থান এবং একটি বিশিষ্ট ভাব,

ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতির পুণ্য নিকেতন। কিন্তু সেই ভারতেই আর ভারতীয় ভাব-ভাষা শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নাই। সবই বিলাত হইতে আমদানী হইতেছে। এ যেন দৈত্যগণের স্বর্গ অধিকার। জড়-বিজ্ঞান এখন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অমর শাশ্বত আত্মাকে মরণের পথে লইয়া গিয়া অ-শাশ্বত বিনশ্বর করিয়া দিতেছে। ভারতের ধর্মশাস্ত্রের বিধান "গাঁজাখুরী"—শ্রাদ্ধ মিথ্যা—মরা গরুতে ঘাস খায় না। গয়ায় পিণ্ডদান—'কুসংস্কার' 'পরলোক' নাই, 'ইহলোকই' সর্বস্ব, দেহের নাশেই সব-কিছুর বিনাশ — কর্মফল মিথ্যা। আয়ুর্বেদ অবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক ডাক্তারী, ইত্যাদি প্রকার বর্ত্তমানে প্রচলিত নূতন কুসংস্কার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে কিছু করা হিন্দুমাত্রের ধর্মীয় কর্ম মনে করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সকল প্রকাশ করিবার জন্য এই নিবন্ধ "মরণের পরে"। কিন্তু ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিবে? তবে কেহ কেহ হয়তো করিতেও পারেন অথবা ভবিষ্যতেও কেহ কেহ করিতে পারেন। কেননা—

"কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বীঃ"।

[নয়]

পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, পূর্ব নিবাস—মেদিনীপুর জেলা, বগড়ী-কৃষ্ণনগর। পরে ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন এই অদ্ভুত ঘটনাটি।

"আমি তখন পি, এম্, বাগচীর পঞ্জিকা আপিসে গণনার কাজ করি। আমার সঙ্গে শিবরামও একই কাজ করিত, তাহার বাড়ীও আমাদের দেশেই।

পঞ্জিকার গণনাকার্য শেষ হইয়া গেল। শিবরাম জ্বর লইয়া দেশে চলিয়া গেল। আমিও আর পি, এম্, বাগচীর আপিসে যাই না—বাড়ীতেই নিজের কাজকর্ম করি, পুঁথিপত্র দেখি।

কিছু দিন পরে একদিন পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল। নিদ্রাভঙ্গে মুখ হাত পা ধুইয়া আবার পড়িতে ও কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলাম। হঠাৎ দেখি, শিবরাম আসিয়া উপস্থিত। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"শিবরাম, আমি তো শুনেছি তুমি এখান হতে জ্বর নিয়ে গেলে, তারপর বসন্ত হয়েছিল; তুমি মারা গিয়েছ—অথচ দেখছি তুমি সশরীরে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কি! তুমি কি মারা যাও নি, আমার সংবাদ কি মিথ্যা?"

শিবরাম বলিল—"সবই সত্যি, আমার মৃত্যুও হয়েছে। কিন্তু আমার দেহত্যাগ হলে কি হবে, আমি দারুণ যন্ত্রণাময় দেহ নিয়ে ভুগছি—কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই, তুমি আমায় উদ্ধার কর। আমি তোমার বৌদির সোনার হার চুরি করে বালিশের মধ্যে পুরে রেখে এসেছি, কেউ জানে না। এখন সেই সোনা চুরির জন্য আমি লোকান্তরে যেতে পারি নি, যন্ত্রণাময় দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি; কাকেও বলতে পারি নি, তুমি যদি তাদের জানিয়ে দাও যে, ঘরে বালিশের মধ্যে হার আছে—তা হলে আমার এই দারুণ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি ঘটে।" এই বলিয়া শিবরাম কোন ঘরে কোন্ বালিশের মধ্যে হার আছে, সব বলে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। আমি তো অবাক্। এ-কি স্বপ্ন না আর কিছু। মানুষ মরিয়া যে আবার আসে তা আমি বিশ্বাস করি না—কাজেই মহা ভাবনায়

পড়িলাম। অবশেষে শিবরামের বাড়ীতে হারের সন্ধান দিয়া চিঠি লিখিলাম—হার পাইলে অতি অবশ্যই আমায় সংবাদ দিবেন।

যথাকালে পত্রের উত্তর আসিল। তাহারা লিখিল—আমাদের হার হারাইয়াছে, আপনি জানিলেন কি প্রকারে? কেহ কি আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল? আপনি গণনা করিয়া সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন? প্রকৃত সংবাদ জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবেন। আমরা আপনার নির্দেশ মত হার বাহির করিয়া লইয়াছি। দারুণ দুর্ভাবনায় দিন কাটিতেছিল। ইতি।

আর একটি ঘটনা।

অধ্যাপক বিধুভূষণ দত্ত আমায় এটি বলিয়াছিলেন। সোমেশ্বর বসু প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ। সোমেশ্বর একবার হরিদ্বার গিয়াছিল। সে প্রত্যহ স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী মহারাজের আশ্রমে যাইত। সোমেশ্বরের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল অনেক দিন আগে, সে আর বিবাহ করে নাই।

স্বামীজী মহারাজের আশ্রমে প্রত্যহ ধর্মালোচনা হইত, অনেক লোক যাইত, সোমেশ্বরও যাইত। সোমেশ্বরের সেই ধর্মালোচনা শুনিয়াই মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সে একদিন স্বামীজী মহারাজকে বলিল—"মহারাজ, আমার একান্ত ইচ্ছা আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করি। কিন্তু আমি স্ত্রীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, যদি কখনও দীক্ষা গ্রহণ করি তো আমরা দুজনে একসঙ্গে দীক্ষা লইব। কিন্তু আমার স্ত্রী দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেজন্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারিতেছি না; অথচ মন মানিতেছে না। দীক্ষা লইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে—কৃপা করিয়া বলুন এখন উপায় কী?"

স্বামীজী মহারাজ সোমেশ্বরকে বলিলেন—"দীক্ষার একটা দিন স্থির কর, সেই দিনে দুইখানি আসন পাতিবে। তার একখানিতে তুমি বসিবে, অপরখানি খালি থাকিবে, তাহাতে তোমার স্ত্রী আসিয়া বসিবে, তাহাকে তুমি দেখিতে পাইবে। কিন্তু স্পর্শ করিবে না। আমি একসঙ্গে দুইজনকেই দীক্ষা দিব, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইবে।" হইলও তাহাই। স্বামীজী মহারাজ একই সঙ্গে দেহী ও বিদেহী দুইজনকেই দীক্ষা দিয়া দিলেন। দীক্ষা গ্রহণের কিছুকাল, বোধহয় বছর কয়েক পরে সোমেশ্বর দেহত্যাগ করে।

আমার কথা—মানুষ যে মরে না, দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়—ইহার শাস্ত্রীয় ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি এই 'মরণের পরে' নিবন্ধে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু ইহা বিশ্বাস কয়জনে করিবে তাহা বলিতে পারিনা। কেননা, বর্ত্তমানে নাস্তিক্য-বিষে ভারতীয় জনগণের চিত্ত বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে, এ বিষের কোন ঔষধ নাই, ওঝা নাই—বৈজ্ঞানিক ইন্‌জেক্‌সনও নাই। তবে যাঁহারা স্বজন-বিয়োগে একান্ত কাতরচিত্ত, তাঁহারা যদি শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণসকল বিশ্বাস করিয়া অন্ততঃ মনে মনে চিন্তা করিয়া চিত্তকে আশ্বস্ত করিতে পারেন যে, মানুষের আত্মার বিনাশ নাই, আমাদের বিদেহী আত্মীয়স্বজনের সহিত মরণের পরে লোকান্তরে সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে, অথবা এই জীবনেই তাহারা আমাদেরই সংসারে কাহারো না কাহারো গর্ভে আসিয়া নবকলেবরে আমাদেরই সহিত মিলিত হইতে পারে—এই বলিয়া চিত্তকে শান্ত করিতে পারেন —তাহা হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া ধন্য হইব।

এখানে আর এক কথা। আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় এখানে যাহারা অসৎ কর্মের দ্বারা জীবনযাপন করে, তাহারা মরণের পর যাতনাময় দেহ ধারণ করে প্রেত হয় এবং অনেকের অপকারও করিয়া থাকে ; নতুবা যাহারা সৎ কর্মের দ্বারা জীবন-যাপন করে তাহারা দেহত্যাগ করিয়া প্রেত হয় না। পুনরায় শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে জন্মগ্রহণ করে, অথবা বিদেহী অবস্থায় অলক্ষিতভাবে আসিয়া অনেকের অনেক উপকার করিয়া থাকে। লোকে যে বলে —'দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছি' সেই দৈবাতের মধ্যে বহু বিদেহী মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে। ভাগবতে দেখা যায়—"ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি" এই সুরপূজিত ভূত তাঁহারাই। যাহা একদিন বর্ত্তমান ছিল, তাহাই অতীতে ভূত। সুতরাং ভূত নাই বা সকল ভূতেই ভৌতিক অত্যাচার করে, এরূপ মনে করিবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। চিন্তাশীল আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় হিন্দুগণের ইহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত বলিয়া আমার মনে হয়।

[দশ]

মণিমোহন রায়চৌধুরী—গড়পারে থাকেন। তিনি একদিন আসিয়া বলিলেন—"আমার কন্যাটি বয়স্থা, বিবাহ হয় নাই। তাহার একটি ৫।৬ বছরের ভাইও আছে, ভাইকে খুব ভালবাসে—সংসারের কাজকর্ম্মও বেশ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকে, আর তখন তাহার একটা আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আসে বলিয়া মনে হয়—এটা কি কোন রোগ ? এ-রোগের একটা চিকিৎসা করিতে পারেন ?"

আমি আয়ুর্বেদের আটটী অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ 'ভূত-বিদ্যার' কথা মনে করিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া জানিলাম—মণিবাবুর মা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি এই নাতনীটিকে খুবই ভালবাসিতেন।

আমি তাঁহাকে আমার 'পেটেণ্ট মেডিসিন' গয়ায় পিণ্ডদানের কথা বলিয়া দিলাম এবং গাছের মূল দিয়া বলিলাম—এটিকে সেই মেয়েটির হাতে ধারণ করাইয়া দিবেন। মূলটি আয়ুর্বেদে 'সহদেবা' নামে পরিচিত ভেষজের মূল—অযোধ্যা প্রদেশ হইতে আনীত।

বেশ কিছুকাল পরে মণিবাবু আসিয়া বলিলেন—"মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়--মেয়েটি আপনার দেওয়া মূল, যেটি তার হাতে বাঁধা ছিল—সেটিকে সে হাত হইতে খুলিয়া একটি কুলুঙ্গীর মধ্যে বাটি চাপা দিয়া রাখিয়া গিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছে।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন মণিবাবু আসিয়া বলিলেন—"আমার ছেলেটিও অকস্মাৎ মারা গিয়াছে, কি হইয়াছিল কিছুই বুঝিলাম না। মেডিকেল কলেজে লইয়া গিয়াছিলাম, চেষ্টা যত্ন চিকিৎসা—কোন কিছুরই ক্রটী ছিল না। ছেলেটি তার দিদির খুবই প্রিয় ছিল।"

আমার ধারণা, মানুষের মরণ নাই। আছে—দেশান্তরের মত দেহান্তর বা লোকান্তর, সেজন্য মণিবাবুর পুত্রের মৃত্যুসময়কে জন্মসময়রূপে নির্দেশ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীকে দিয়া একটি কোষ্ঠী করিয়া রাখিলাম। আর মণিবাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলাম—"প্রতিদিন কিছু অন্নপানীয় ছেলেটির উদ্দেশ্যে নিবেদন

করিয়া বলিতে—'বাবা তুমি খাও', কিন্তু কেহ ছেলেটিকে মনে করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে বা কাঁদিতে পাইবেন না।" এইরূপ চলিতে থাকিল। পরে একদিন মণিবাবু আসিয়া বলিলেন—"আপনার ব্যবস্থামত সব চলিতেছে, আমরা কাঁদিনা।" তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এইবার আপনি গয়াধামে গিয়া মা ও কন্যাকে পিণ্ড দিয়া আসিবেন, কিন্তু ছেলেটির পিণ্ড দিবেন না।"

মণিবাবু গয়া গিয়া পিণ্ডদান করিয়া আসিবার পরে, বোধহয় বছর খানেক বা দেড়-দুইএর পর মণিবাবুর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে নিবেদ্য অন্নপানীয় বন্ধ হইয়া গেল। সেই পুত্র শ্রীভগবৎ-কৃপায় অদ্যাপি জীবিত।

মণিবাবুর পুত্র-জন্মের কিছুকাল পরে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু বেশী দিন সেখানে বিদেহী অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। সংসারের আসক্তিতে পুনরায় মণিবাবুর দ্বিতীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমি তাহা জানিতাম না।

একদিন মণিবাবু আসিয়া বলিলেন—"আমার বাবা আবার ফিরে এসেছেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ-ছেলেটি যে আপনার পিতা ছিলেন, তাহা আপনি জানিলেন কি করিয়া?"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"এই ছেলেটির প্রকৃতি, প্রবৃত্তি আচরণ সব কিছু আমার বাবার মত, অধিকন্তু সে তার মাকে পছন্দ করে না। আমি খাওয়ালে খায়, আমার কাছে শোয়, সদাসর্বদা আমার কাছে থাকে, তার জন্য আমার বাড়ী থেকে বেরোন দায়—ইত্যাদি।"

ইত্যবসরে একদিন একজন পণ্ডিত আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তিনি আমার পূর্ব-পরিচিত। নাম — শ্রীপদ্মনাভ উপাধ্যায়, নিবাস—বালিয়া জেলায় শোনবর্ষা গ্রামে। কাশীতে বেদের কর্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত। নিষ্ঠাবান্ সদাচারী ব্রাহ্মণ।

আমি মণিবাবুর বিদেহী পুত্রের জন্মপত্রটি, যাহা মণিবাবুর প্রথম পুত্রের মৃত্যুর সময়কে অন্য জন্মের লগ্ন ধরিয়া করা হইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিতে দিলাম। পণ্ডিতজী তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কিছুকাল নির্বাক্ নিষ্পন্দ অবস্থায় থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আপনি এ কোষ্ঠী কোথায় পাইলেন? এর তো পাঞ্চভৌতিক অন্নময় দেহ নাই, এ-তো সূক্ষ্মশরীরী বিদেহী আত্মার কোষ্ঠী—বড়ই আশ্চর্য, এ কোষ্ঠী আপনার কাছে! এরকম কোষ্ঠী কোন জ্যোতিষীর ঘরে নাই, ইহা দেখিয়া কেহ কোন বিচার করিতে পারিবে না। আমি আমার পিতৃদত্ত বিদ্যার কৃপায় ইহার বিচার করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। আমাদের বাড়ীতে অতি প্রাচীন পরাশর-সংহিতা আছে, যাহাতে এই সকল বিষয়, এমন কি কোন গরুর বাছুর জন্মিলে, সে পূর্বজন্মে কি ছিল, কোন্ কর্মের ফলে ইহার এই পশুজন্ম—সে-সব বলিয়া দিতে পারা যায়। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি।"

তারপর আমি মণিবাবুর যে পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল, যাহার মৃত্যুকে বিদেহী, অন্নময়-কোষবিহীন আত্মার জন্মলগ্ন স্থির করা হইয়াছিল—সেই কোষ্ঠীটি দেখিতে দিলাম।

পণ্ডিতজী মণিবাবুর পুত্রের প্রথম-জন্মের কোষ্ঠীটি দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন—'এ-তো তারই কোষ্ঠী; যে অন্নময় স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করিয়াছিল—যাহার এই সূক্ষ্ম দেহের কোষ্ঠী। আর আমি আপনার এই কোষ্ঠী দেখিতে পারিতেছি না, আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ—এসব কোষ্ঠী আপনার কাছে আসিল কি করিয়া? আপনি কি জানিতেন, মরণের পরেও কোষ্ঠী করা চলে?'

অতঃপর আমি পণ্ডিতজীকে মণিবাবুর যে পুত্রটি বর্ত্তমানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কোষ্ঠীটি দেখিতে দিলাম। তাহা দেখিয়াই পণ্ডিতজী অতি বিস্মিতভাবে বলিলেন—"এ সেই পাঞ্চ-ভৌতিক অন্নকোষহীন বিদেহী আত্মার তৃতীয় দেহের কোষ্ঠী। মানুষ যে মরে না, দেহ পাল্টাইয়া জন্মগ্রহণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এইজন্য গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" ইহা অপরিহার্য।

ইহার কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিতজী কিছু আশ্বস্ত হইয়া আপন মনে স্বগতভাবে বলিলেন—

"পহলেবনা প্রারব্ধ-পীছেবনা শরীর।
তুলসী বড়া আশ্চর্য হৈ মন না মানত থীর।"

ইহার অর্থ পণ্ডিতজী বলিলেন—পূর্বজন্মকৃত কর্ম—প্রাক্তন। প্রাক্তন কর্মের ফল—ইহজন্মে যাহা ভোগ্য, তাহাই প্রারব্ধ। প্রারব্ধ কর্মের অনুরূপ শরীর। শরীর ধারণ করিয়া যাহা যাহা করিতে হইবে, সে সমস্তই পূর্বে স্থির হইয়া আছে, ভোগ করিতে হয়—ইহার অন্যথা হয় না, ইহারই নাম ভাগ্য। ভাগ্যবলে সুখ-দুঃখ আসে, ভোগ করিতেই হয়। যাহা অবশ্য ভোগ্য তাহার সম্বন্ধে অনুযোগ করিবার

কিছুই নাই। তথাপি মন মানে না। মনে হয় ইহা না করিলেই চলিত, উহা করিলে ভাল হইত। কিন্তু করা, না করা, মানুষের হাতে কিছুই নাই, মানুষ যন্ত্রচালিত পুতুলের মত সব কিছু করিতে বাধ্য হয়। অথচ তাহার কর্ত্তৃত্বের অভিমান যায় না, ইহাই আশ্চর্য।

একই মানুষের তিন-তিনটা জন্ম। কোন্ জন্মের কি কি কাজ, কোন্ জন্মে কোন্ কোন্ কর্মের ফলভোগ করিয়া তাহাকে যাইতে ও আসিতে হইতেছে—সে সমস্তই পণ্ডিতজী বলিলেন।

কিমাশ্চর্যাতঃপরম্।

[এগার]

বর্ত্তমানে সাধারণ মানুষমাত্রের ধারণা, মানুষের মরণের সঙ্গেই তাহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব স্ত্রীপুত্র পরিবার, দৌলত-ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব সব কিছু ফুরাইয়া যায়। কিন্তু তাহারা জানে না যে মানুষের দেহের নাশ হইলেও মনের নাশ হয় না, মন তাহার সঙ্গে লোকান্তরে চলিয়া যায়, আর সেই মনের সঙ্গে তাহার স্মৃতি সংস্কার জ্ঞান অভিমান প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেক কিছু রহিয়া যায়—সে সকল কর্ম এবং তাহার ফল, সব কিছু মরণের পর পরলোকে এবং পুনরায় জন্ম গ্রহণের পরেও ভোগ করিতে হয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এবারে কথিত হইতেছে।

অনেক দিনের কথা। ডাঃ হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি—টীচার, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল, আমায় বলিলেন—চল তোমাকে এক রোগী দেখাইয়া আনি। রোগ মুর্চ্ছা, কিন্তু এ মুর্চ্ছা ডাক্তারী বা কবিরাজী নয়, কাজেই ঐ সকল চিকিৎসায় কিছুই হয় নাই।

ডাঃ হেমচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে সঙ্গে লইয়া ডিক্সন লেনে একটা মেডিকেল মেসে লইয়া গেলেন।

দেখিলাম—রোগী যুবক, অজ্ঞান অবস্থায় শুইয়া আছে। পাশে কয়েকটী বলিষ্ঠ ছাত্র, তাহার হাতে যেখানে মাতুলী বা তাবিজ বাঁধে, সেখানে কাপড় জড়াইয়া দিয়া ধরিয়াছে। ডাক্তার মহোদয় যাইতেই তাহারা হাতের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিল, এই দেখুন— স্যার হাতে মাতুলী নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখিবেন, হাতে মাতুলী আসিয়াছে, মূর্চ্ছাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে, সোজা মানুষ।

ডাঃ সেন মহাশয় অনেক কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জিজ্ঞাসাও অনেক কিছু করিলেন। তারপর নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে রোগী জাগিয়া উঠিয়াই ডাঃ সেনকে প্রণাম করিল, যেন নিদ্রাভঙ্গ, কোন কিছু হয় নাই।

আমরা চলিয়া আসিলাম। ডাঃ সেন আমায় বলিলেন— সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা করিও, অনেক কথা আছে।

যথাকালে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি বলিলেন, "আমি এই ছেলেটির অবস্থা দেখিয়া আমাদের দলের চাঁই অর্থাৎ থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর গোষ্ঠীপতি উকীল রাজেন মুখার্জী ও এটর্নী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দুইজনকে এই ছেলেটিকে দেখাইতে আনিয়াছিলাম। সেদিন রবিবার দুইজনেই বহুক্ষণ বসিয়া ছিলেন। তাহার পর রাজেনবাবু ছেলেটির সহিত অজ্ঞান অবস্থাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার সম্বন্ধে জানিয়াছিলেন।

ছেলেটির বিবাহের কিছু দিন পর হইতে হঠাৎ মূর্চ্ছা হইতে

থাকে। ইহার নিবাস মুর্শিদাবাদ—জিয়াগঞ্জ, বালুচর। মূর্চ্ছা রোগের ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা করা হইয়াছিল, কিছুই হয় নাই। তারপর অনেক দিন ভালও ছিল। এখন দেখা যায় সেই মাতুলী হাত হইতে চলিয়া যায়, মূর্চ্ছা হয়, মাতুলী আসে, মূর্চ্ছা ভাঙ্গে। কে মাতুলী লয়, কে দেয়, কিছুই জানা যায় না।

রাজেনবাবু বলিলেন,—এই ছেলেটি যে মেয়েটিকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে একটা ছেলেও পড়িত, দুইজনে খুব ভাব। পরস্পরে বিবাহ করিবার কথা বা প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু মেয়েটির পিতা কি কারণে জানি না সেই ছেলেটির সঙ্গে বিবাহ না দিয়া ইহার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে,—সে ছেলেটি আত্মহত্যা করিয়াছে। তারপর হইতে এই ছেলেটির মূর্চ্ছা দেখা দিয়াছে, সেজন্য চিকিৎসা করা হইয়াছিল—কিছুই হয় নাই। একবার তখন গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড রৌদ্র, গঙ্গা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। ছেলেটি গঙ্গা স্নান করিয়া চড়ার ধারে ধারে ছায়ায় ছায়ায় বাড়ী ফিরিতেছিল হঠাৎ ছেলেটির দাদা বলিল—"দাঁড়া যাসনি, এই চড়াটা ধ্বসে পড়বে, মারা যাবি।" ঠিক তাই হইল—ছেলেটি বাঁচিয়া গেল। তখন সেই দাদা একটি মাতুলী দিয়া বলিল,—ধারণ কর, কোন ভয় নাই। দাদা অনেক দিন আগেই মৃত। তারপর ছেলেটি বেশ ভালই ছিল, কোন রোগ নাই, পড়াশুনা করে, হঠাৎ আবার মূর্চ্ছা দেখা দিল, হাতে মাতুলী নাই, কে জানে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পরে, মৃত দাদা আসিয়া বলিল, "দেখ, মাতুলী প্রভাবে সে আর তোকে ছুঁতে পারে না, কিন্তু আর একজনকে সে ডেকে এনেছে যে এখন তোর মাতুলী নিয়ে যায়; মূর্চ্ছা হয়।

কোন ভয় নাই, ভাবিস্ না, আমি তার কাছে থেকে মাতুলী কেড়ে নিয়ে এসে তোকে পরিয়ে দেবো।" এই অবস্থা চলিতেছে।

তারপর আমি শুনিয়াছিলাম—ছেলেটি ভাল হইয়া গিয়াছে, ক্যাম্বেল হইতে ভালভাবে পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে।

[বার]

মানুষের দুই অবস্থা। এক অবস্থায় সে মরণশীল, অপর অবস্থায় সে অমর। মরণশীল মানুষ, শরীর মন ও আত্মাকে লইয়া আমি-তুমি-সে-রূপে বিরাজ করে। আর অমর মানুষ—যাহা মন ও আত্মাকে লইয়া সূক্ষ্ম শরীরী পুরুষরূপে লোকান্তরে বিরাজ করে। কেহ কেহ বলেন যে, মানুষেরও মরণ আছে। যেমন মহাপ্রলয়ে পুরুষ প্রকৃতিকে লইয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইয়া যান। তাহার পূর্বে নহে এবং যতদিন তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' না হয়েন, ততদিন তিনি বহু ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বা জীবাত্মারূপে বিরাজ করেন—ইহলোকে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া এবং পরলোকে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া। এই সকল সূক্ষ্মশরীরী পুরুষ যে সকল স্থানে আসিয়া শরীর ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় যোনি। যোনি বা জন্মস্থান। সুশ্রুত বলেন—যোনি ত্রিবিধ। যথা—তির্যক, মনুষ্য ও দেবযোনি। আর চরক বলেন—চতুর্বিধ, যথা—স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষ-লতাদির দেহ, জরায়ুজ—মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির দেহ, যাহা জরায়ু বা মাতৃগর্ভে রচিত হয় এবং অণ্ডজ—যাহা অণ্ড বা ডিম্ব প্রভৃতির মধ্যে রচিত হয়, যেমন, পক্ষী

প্রভৃতির দেহ, আর স্বেদজ—স্বেদ বা ঘর্ম এবং মল, মূত্র, পুঁয রক্ত প্রভৃতি দ্বারা রচিত হয়।

সুশ্রুতের এই ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে তির্যক ও মানুষ-দেহ সর্বজন পরিচিত। অপর দেবযোনিতে রচিত শরীর চরকের মতে "ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুম্" অর্থাৎ যাহা চোখে দেখা যায় না। অতএব ইহা না থাকিতেও পারে বলিয়া সন্দেহ করিতে পারা যায়, কিন্তু আয়ুর্বেদের ভূতবিদ্যার মধ্যে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি এই দেহের প্রথম সন্ধান পাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য নগেন্দ্রবাবুর নিকট এবং 'ওপারের কথা'র লেখক নৃপেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের নিকট।

আচার্য নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন—"বিজয় (গোস্বামীজী) আমাকে অনেক দেহধারী দেবতা দেখাইয়াছে, তাহাদের স্থানসকল পরলোকে। দিব্যদৃষ্টি বা যোগদৃষ্টিতে সে-সকল স্থান দেখা যায়।" আর নৃপেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ও আমাকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন। অধিকন্তু যাহারা বাসনা কামনা লইয়া দেবতার আরাধনা করে, অহংকার ত্যাগ করে না, নিষ্কাম হইতে পারে না, তাহারা মরণের পর দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে বিরাজ করে, কেহ কেহ বা ইহলোকে গৃহস্থের আরাধ্য দেববিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে, বিবিধ উপচারে পূজা পায়, গৃহস্থের কল্যাণ করে এবং অসন্তুষ্ট হইলে অনিষ্ট করিতেও ক্রুটী করে না। গৃহস্থের অধিকাংশ শালগ্রামের মধ্যে এই সকল দেবতার আবির্ভাব দেখা যায়। ইহা তাঁহার স্বরচিত আত্মজীবনীর মধ্যেও বোধ হয় দেখিতে পাওয়া যায়।

দৈবক্রমে আমি এতাদৃশ এক দেবতার দেখা পাইয়াছিলাম।

একটি স্থানে তেতলার ঘরে। একটি টবে লাগান তুলসী গাছের গলায় মালা দেওয়া অশরীরী দেববিগ্রহকে দেখিলাম। তাহার মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু, তুলসীগাছটির চারিদিকে কয়েকজন বৈষ্ণব খোল ও খঞ্জনী বাজাইয়া 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম', বলিয়া এপাশ ওপাশে দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে, আর সেই সঙ্গে তুলসীগাছটিও শাখা-পত্রাদি লইয়া এপাশ-ওপাশ দিয়া দুলিতেছে—যেন একটি তুলসী-বৃক্ষরূপী বৈষ্ণব। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়াও রহিলাম। কীর্ত্তনরত বৈষ্ণবগণের প্রদক্ষিণ বিরত হইল—তুলসীগাছটিরও এপাশ-ওপাশ হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য বা আন্দোলনেরও বিরাম ঘটিল।

ঘটনাটি ঘটিয়া ছিল কলিকাতার একটি বিশিষ্ট ভদ্রসম্প্রদায়ের আত্মীয়, পরম বৈষ্ণবের বাড়ীতে। থাকিতেন দেশবন্ধু পার্কের পশ্চিম দিকে রাস্তার পাশেই একটা তেতলা বাড়ীতে, ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখার্জির বাড়ীর ঠিক দক্ষিণে। ইঁহাদের নাম আমি প্রকাশ করিব না। সেখানে গৃহস্বামীর পুত্রবধূ পীড়িত, রোগ —মাথার গোলমাল। কত কি বকে, ঘুমায় না, ইত্যাদি। ইহাকে চিকিৎসার জন্য আমি সেই বাড়ীতে গিয়াছিলাম।

কীর্ত্তনের পর আমি রোগিণীকে দেখিয়া নীচে বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। রোগিণীর বৃদ্ধা শাশুড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, বৌমার কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "মা, তোমার বৌমাকে ভূতে পাইয়াছে, এটা ভৌতিক রোগ।"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বাবা, হরিসংকীর্ত্তন যেখানে হয়, সেখানেও ভূত ?"

এমন সময়ে রোগিণীর কন্যা উপর হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বলিল, "মা কেমন করছে, আপনাকে ডাকছে, শীঘ্র আসুন।"

আমি বলিলাম—"তোমার মাকে নীচে আসতে বল, আমি আর উপরে উঠতে পারছি না।"

মেয়েটি উপরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মা বলেছে তার নামবার শক্তি নাই।"

রোগিণীর শ্বাশুড়ী বলিলেন—"আপনি যাবেন না ? বৌমা যে কেমন কেমন করছে।"

ইত্যবসরে রোগিণী স্বয়ং নামিয়া আসিয়া তিরস্কার করিয়া রোষভরে বলিল, "তুমি কি এদের বুদ্ধিভেদ ঘটাচ্ছিলে ? রোগ নয়, ভূত ? তুলসীগাছে ভূত ? রোগীতে ভূত ? বলত—ক'টা ভূত এসে জুটেছে ?"

আমি বলিলাম—"তিনটা। একটা মেয়ে, দুটো পুরুষ। পুরুষ দুটোর মধ্যে একটা তুলসীগাছে, আর একটা তোমাতে বা তুমিই।"

রোগিণী বলিল—"এত খবর তুমি জান ? আচ্ছা, আমি তোমার বাড়ীতে যাবো।"

আমি বলিলাম—"আমার বাড়ীতে গেলে তোমায় সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় করব।"

রোগিণী বা ভূত বলিল—"এতবড় আস্পর্দ্ধা, তুমি কি কখনও আমার নাম করবে না ? সেই সময় আমি গিয়ে উপস্থিত হব।

তখন তো আমার নিজে থেকে যাওয়া হবে না। জান না—নাম করলে কি ভগবান, কি ভূত—সেই গিয়ে হাজির হয়? এমনই নামের প্রভাব—নাম যে-সে নয়।"

(এইখানে একটা কথা—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে মহাশয় আমায় বলিয়াছিলেন—"কদাচ ভূতের কাছে নতিস্বীকার করো না, একটু নরম হলেই ওরা পেয়ে বসে।")

এই সময় রোগিণী বা ভূত হঠাৎ কুপিত হইয়া আমায় বলিল —"ঐ যে দেখছ বুড়ী ঐ-ই যত অনিষ্টের মূল। আমি মেয়েটিকে পড়াতাম, বেশ ভাল মেয়ে। আমি ওকে যেমন ভালবাসতাম, তেমনি ও আমাকে ভালবাসতো। আমাদের মধ্যে বিয়ে হবে আমরা দু'জনে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বাড়ীর কেউ জানত না। এমন সময় ঐ বুড়ী ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে মেয়েটিকে দেখতে গেল। দেখেই বললে—'বেশ, খাসা মেয়ে। আমার ছেলের বৌ করব'। করলও তাই। বিয়ে হয়ে গেল। মনের দুঃখে আমি আত্মহত্যা করলাম। তারপর থেকেই চেষ্টা—ওকে বিধবা করতে। কিন্তু বোষ্টমের বাড়ী, তা পারলাম না। সেজন্য একজনকে জোগাড় করলাম, যে বোষ্টম কিন্তু কামনা-বাসনার বশে সদ্গতি না হওয়ায় এই অবস্থা হয়েছে, তবে ও বেশ পরহিতৈষী—তাই ওর সাহায্য নিয়েছি। ও এই বাড়ীতেই থাকে, সেজন্য ওর কাছে আসতে বাধা হয় না, কিন্তু এই মেয়েটির প্রতি আমার টান যায় না, সেইজন্য এর পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতাম—এখন পেয়ে বসেছি।"

যাহা হউক সেই বিদেহী আত্মা তার নাম-গোত্র সমস্তই জানাইয়া দিয়াছিল। গয়ায় পিণ্ড দেবার পরে তাদের সেই অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার ফলে সে আর দেখা দেয় নাই, মেয়েটিও অতঃপর সুস্থ হয়। সে এখনো বাঁচিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে বিশেষতঃ বিজয়া দশমীর পর আমার সহিত দেখা করিতে আসে। অতি সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যাপার বলিয়া তাহার নাম প্রকাশ করা হইল না। মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন,—

"অতীন্দ্রিয়ৈস্তৈরতিসূক্ষ্মরূপৈঃ আত্মা কদাচিৎ ন বিযুক্তরূপঃ।
ন কর্ম্মণা নৈব মনোমতিভ্যাং ন চাপ্যহংকারবিকারদোষৈঃ ॥"

অর্থাৎ মানুষের দেহত্যাগের পর, তাহার আত্মার যে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় আতিবাহিক দেহ রচিত হয়, তাহা হইতে সে কখনও বিযুক্ত হইতে পারে না; তা ছাড়া, সে যে কর্ম করিয়াছিল, সেই কর্মের ফল এবং বাসনা কামনায় পরিপূর্ণ মন, তদনুরূপ বুদ্ধি ও 'আমি রাগী, ভোগী, প্রেমিক বা ইহাকে আমি চাই' ইত্যাদি মনোভাবযুক্ত আমিত্বও কখনও ত্যাগ করিতে পারে না। যাহার জন্য ব্যর্থপ্রেমিক ছাত্র মরণের পরেও যেমন ছিল, তেমনই একটি বিদেহী মানুষ হইয়া ক্যাম্বেলের ঐ ছেলেটিকে মারিবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিল এবং নিজের ক্ষমতায় কুলায় নাই বলিয়া অপর একটি বিদেহী আত্মার শরণ লইয়াছিল (পূর্ব প্রবন্ধে উক্ত)। এ জগতে যেমন মানুষ আর একজন ভাল মানুষের সাহায্য লয়, তেমনই পর-জগতেও একজন বিদেহী মানুষ আর একজন বিদেহী মানুষের শরণ লয়,—ইহা পূর্ব ও এই প্রবন্ধে দেখা গেল। মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন—

"স সর্বগ, সর্বশরীরভৃৎ চ স বিশ্বকর্মা স চ বিশ্বরূপঃ।"

সেই বিদেহী আত্মা—সকল স্থানে যাইতে পারে—সকল প্রকার শরীর ধারণ করিতে পারে,—তাহার অকর্ম কিছু নাই,—সে বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপ বিশ্বকর্মা বিদেহী আত্মা তুলসী বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া কীর্ত্তনের তালে হেলিয়া দুলিয়া হরিনাম শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং আর একজন ব্যর্থ-প্রেমিক বিদেহী-পুরুষকে সাহায্য করিবার জন্য একটি বৈষ্ণবগৃহস্থের পুত্রবধুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

[তের]

একদিন,—একটি পূর্ব-পরিচিত ভ্রাতৃপ্রতিম ভদ্রলোক আসিয়া বলিল—"দাদা আপনি বোধহয় শুনেছেন—রাম (সেকালের অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর ভাই রামরঞ্জন গোস্বামী) মারা গিয়েছে। সে এম্-এ পাস করার পর বিহারে থাকিত, মাষ্টারি করিত,—তার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটির বিবাহ হয়েছে। ছেলেটি খুব ভাল। বরাবর ফার্ষ্ট হইত, কখনও সেকেণ্ড হয় নাই। এম্-এতেও সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। কিন্তু রামের মৃত্যুর পরে তাহাকে বিমনা দেখা যাইত। এখন সে সর্বদা বিষণ্ণ—বিমর্ষ। কারো সঙ্গে কথা কয় না। পাঁচ মাসের ছুটি লইয়া বাড়িতেই বসিয়া আছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম, রামের মৃত্যুতে তার এই রকম অবস্থা হইয়াছে।

এখন দেখিতেছি তাহা নয়। আপনি একবার তাহাকে দেখিবেন ?" আমি পরদিন সকালে আনিতে বলিয়া দিলাম।

রাত্রে শুইয়া আছি, মনে হইল, কে যেন একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছে—তাহার মূর্ত্তি কিছুই দেখিতে পাইলাম না, অথচ কথা শুনিতে পাইলাম। মনে হইল মেয়েমানুষ।

বিদেহী মেয়েটি বলিল—"দেখুন কাল আমার ছেলেটি চিকিৎসার জন্য আসিবে। আমি তার মা। আমার স্বামীর মৃত্যুর বছর তিন পূর্বে আমার মৃত্যু হইয়াছে। আমি ছেলেটিকে খুবই ভালবাসিতাম, এখনও ভালবাসি। ছেলেটিকে আমি ঠাকুর দেবতায় ভক্তি, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি শিখাইতাম—কেন না, আমি সেই নিয়া থাকিতাম। ছেলেটি বেশ শিষ্ট শান্ত সদাচারী।

তারপর আমার মৃত্যু হইল। স্বামী আমার কবিতাও লিখিতেন। তাঁহার একজন অহিন্দু বন্ধু ছিল—খুব স্বদেশী বলিয়া নাম ডাক। তিনিও কবি। দুই বন্ধুতে এমনই ভাব সাব যে—স্বামী আমার যেন তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া ক্রমশঃ হিন্দুর আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে লাগিলেন, বলিতেন—'বামুন আবার কিসের। জাতের নামে বজ্জাতি,—সব মানুষই মানুষ।'

আমার মৃত্যুর পর, ছেলেটিও কেমন যেন হিন্দুর আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল, তবে অখাদ্য কিছু খাইত না। আমি কিন্তু মরণের পরেও তাহার কাছছাড়া হই নাই। আমার একান্ত ইচ্ছা—ছেলেটি বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিবে, সুখে থাকিবে, আমিও দেখিয়া সুখী হইব। কিন্তু আমার স্বামীর তাহা ইচ্ছা নয়। তিনি

দেহত্যাগের পর অনবরত ছেলেটি যাহাতে তাঁহার কাছে আসে, তার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তার অপমৃত্যু ঘটিলেই তিনি যেন খুসী হন। আপনি এর কিছু ব্যবস্থা করিতে পারেন? যাহাতে ছেলেটি আমার সেইখানেই থাকে, সুখে ঘরসংসার করে।” কথা শেষ, আমিও আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না, মনে হইল আমার জাগ্রৎস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

পরদিন তার কাকার সঙ্গে ছেলেটি আসিল। বড়ই বিমর্ষ, বিষণ্ণ, কোন কথাই বলে না। তার কাকাকে অন্যত্র বসিতে বলিয়া ছেলেটিকে তার বাল্যের অবস্থা, মার প্রকৃতি প্রবৃত্তি আচরণ সব কিছু বলিলাম, কিন্তু তাহার মায়ের কথা কিছুই বলিলাম না, কেন না তাহার মায়ের আসা তাঁহার কথাবার্ত্তা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ছেলেটি কিন্তু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল—আমাকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—“আপনি এ-সব জানিলেন কি করিয়া? আমি তো কখনও আপনার কাছে আসি নাই, আপনিও আমাদের বাড়ী যান নাই, মাকেও দেখেন নাই, অথচ যাহা যাহা বলিলেন সবই সত্য। আপনি আমার চিকিৎসা করুন, যাহাতে আমি প্রসন্ন মনে সকলের সঙ্গে পূর্ব্বের মত মিশিতে পারি—কাজ করিতে পারি।”

ছেলেটির কাকাকে ডাকিয়া দুই সপ্তাহের ঔষধ দিলাম, কিন্তু ছেলেটির মা’র এবং তাঁহার সঙ্গে যে সকল কথা হইয়াছিল, সে সব কিছুই বলিলাম না।

ঔষধ লইয়া যাইবার প্রায় দিন দশ পরে ছেলেটির ভগিনী আসিয়া বলিল,—“আমার ভাই আপনার ঔষধ খাইয়া বেশ ভালই

ছিল, সেইজন্য পাটনায় চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রে চলিয়া গিয়া বিহার বখ্‌তিয়ারপুর রেল লাইনে গলা দিয়া শুইয়া থাকে। তখন রাত্রি প্রায় শেষ, ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। একটা ট্রেন আসিতেছিল। ড্রাইভার দূর হইতে ট্রেন থামাইল অতি কষ্টে। ভাই কাটা পড়িল না, কিন্তু তাহার গায়ে কয়েক স্থানে আঘাত লাগিল। ড্রাইভার তাহাকে উঠাইয়া লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া পুলিশে দিল। সে এখন পুলিশ হেপাজতে হাসপাতালে আছে, কি করিব" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—"বোধহয় তোমার পিতার শ্রাদ্ধে কোন ত্রুটি হইয়াছিল, সেজন্য তিনি অপ্রসন্ন। তুমি গয়া গিয়া তাঁহার পিণ্ড দাও। তিনি প্রসন্ন হইলে সব ভাল হইয়া যাইবে।" মেয়েটি বলিল—"অপর কেহ পিণ্ড দিলে হইবে? আমার খুড়তুত কোন ভাই?" আমি বলিলাম—"মনে হয়, তোমার ভাই বা তুমি দিলেই ভাল হয়।"

এই ঘটনার প্রায় মাসখানেক পরে সেই ছেলেটির ভগিনী আসিয়া বলিল—"আমার খুড়তুত ভাইকে লইয়া আমি গয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু পাণ্ডা আমায় পিণ্ড দিতে দিল না। বলিল—'তোমার স্বামী পুত্র আছে, পিণ্ড দিতে দিব না।' অগত্যা আমি কাশীতে গেলাম। সেখানে আমার এক বৃদ্ধ মামা ছিলেন, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া আবার গয়াতে আসিলেন। পাণ্ডারা কেহই রাজী নহে। তখন মামা এক পরিচিত বৃদ্ধ পাণ্ডার কাছে বলিলেন—'এক সিদ্ধ সাধুপুরুষ আদেশ করিয়াছেন মেয়েটি পিণ্ড না দিলে ইহার পিতার সদ্‌গতি হইবে না।' পাণ্ডা রাজি হইল, পিণ্ড দেওয়া হইল।

আমি পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার ভাইকে পুলিশ ছাড়িয়া দিয়াছে। বেশ ভাল আছে, আবার কর্মে যোগদান করিবে স্থির করিয়াছে।”

এই সকল ব্যাপারের বহুদিন পরে সেই ছেলেটির কাকা—যিনি আমাকে তাহার চিকিৎসার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে বলিলেন—“আপনার চিকিৎসা অদ্ভুত। আমরা শ্রাদ্ধে কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই, তবে তার অগতি হইল কেন ?

তবে মনে হয়, শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পরেই আমার ভাই-এর সপিণ্ডকরণ সেই ছেলেটিকে দিয়া করাইয়া দিয়াছিলাম। শুনিয়াছি শ্রাদ্ধের এক বৎসর পরে সপিণ্ডকরণ করিতে হয়। বোধ হয় অকাল-কৃত কর্মের ফলে তাহার পরলোকগত আত্মার কোন প্রকার অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। সেই জন্য তাহার পিতা কুপিত হইয়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।” ইহার বহুকাল পরে শুনিলাম, সেই ছেলেটি এখন এখানকার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হইয়াছে এবং বিবাহও হইয়াছে হাইকোর্টের কোন জজের কন্যার সহিত।

কিন্তু সে ছেলেটি আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই,—বলে,—তাঁহাকে আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, এবং ভয়ও করি। সেইজন্য তাঁহার কাছে যাই নাই।

হিন্দুশাস্ত্র মতে, মরণের পর শ্রদ্ধাপূর্বক যে দান, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। এই শ্রদ্ধার ত্রুটি হইলে দেবভাব প্রাপ্ত যাঁহারা, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। বহুকাল পূর্বে আমি একবার বীরভূম

জেলার লাভপুরে গিয়া "ফুল্লরাপীঠে" পূজা দিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম সেই পীঠস্থানের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গলে তুইটী শিবা (শৃগাল) আছে। পীঠস্থানে কোন কিছু ভোগ্য প্রদান করিলে, পুরোহিত তাহাদিগকে আহ্বান করিলে, দেবী শিবামূর্ত্তিতে আসিয়া ভোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভোগপ্রদাতার চিত্তে ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব থাকিলে শিবারূপী দেবী ভোগ গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যান। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট।

"শ্রদ্ধাভুজোহি দেবা ভবন্তি।"

[চৌদ্দ]

'জন্মিলে মরিতে হবে'—মানুষমাত্রে যেমন জানে, তেমনি 'মরিলে জন্মাতে হবে' এ কথা সকলে জানে না। কিন্তু আগেকার কালে হিন্দুমাত্রেই জানিত। শুধু জানিত নহে, পুত্র বা কন্যার জন্মের পরে পিতা বা মাতার মৃত্যু দেখিয়া লোকে অনুমান করিত, জাত শিশুর সঙ্গে তাহার পিতা মাতার এমন একটু প্রাক্তন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ ছিল, যাহার জন্য তাহাদিগকে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, পুত্রকন্যাকে লইয়া আর সুখে সংসার করিতে হয় নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে যে, 'পিতৃরিষ্টি বা মাতৃরিষ্টি' দেখা যায়, তাহার মূল কারণও বোধহয় এইরূপ কিছু একটা হইবে।

শুধু পিতৃরিষ্টি বা মাতৃরিষ্টি নহে,—ভ্রাতৃরিষ্টি বা ভগিনীরিষ্টি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া সেই কথাই আজ বলিতেছি।

ভদ্রেশ্বরের গুড্স মাষ্টারের এক কন্যার জন্মের পর যখন

তার বয়স পাঁচ ছয় বৎসরের হইবে, তখন তাহার একটি ভাই জন্মগ্রহণ করে। ভায়ের জন্মের পরেই তার দিদির পেটের অসুখ দেখা দেয়। বিবিধ চিকিৎসায় কিছু না হওয়ায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহার চিকিৎসা করিতে থাকেন। তাও দুই বৎসর কাটিয়া যাওয়ার পর, যখন মেয়েটি সারে না, মরেও না। তখন তাহার পিতা আমার নিকটে লইয়া আসে। আমি তাহার নাড়ী ও রোগবিবরণ বিশেষ ভাবে শুনিবার পর মনে হইল—"শোকোৎপন্নো দুশ্চিৎকিস্যোঽতিমাত্রম্" অর্থাৎ যে অতিসার বা পেটের অসুখ শোক হইতে উৎপন্ন, তাহা সহজে সারে না। শোক শব্দের অর্থ— এখানে দুশ্চিন্তা ভাইটির প্রতি ভগিনীর হিংসা। (এইখানে অনেক কথা বলিবার রহিয়া গেল) আমি মেয়েটির সঙ্গে রফায় ব্যবস্থা করিলাম— ভাই মায়ের দুধ খায়, কাজেই সে মায়ের ভাগে রহিয়া গেল, বাবা কিন্তু তাহাকে ছুঁইবে না, লইবে না, এমন কি তাহাকে দেখিবেও না। কিছুদিন পরে মেয়েটি বেশ সারিয়া উঠিল। বেশ সুস্থ সবল। তারপর তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পরে আমি একবার তাহাদের বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। মেয়েটি আমায় দেখিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

আর একটি ঘটনা,—দমদমার দক্ষিণাঞ্চল হইতে একটি মেয়ে আসিয়াছিল, রোগ "মৃতবৎসা"। পূর্বজাত সন্তানের মৃত্যু হয়, পরবর্ত্তী সন্তানের আট মাস বয়স হইলে। তাহার অন্যথা হয় না— এইরূপে কয়েকটি সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে। এই মেয়েটি আরোগ্য লাভ করে আয়ুর্বেদসম্মত দৈব মুনি মন্ত্রাদি প্রভাবে এবং যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসার দ্বারা। আমার মনে হইয়াছিল দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ বিদেহী আত্মার প্রাক্তন বিদ্বেষই ইহার কারণ।

এইখানে আমি একটি অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি,— এই মন্ত্রের প্রভাবে ভূতবাধা অর্থাৎ বিদেহী আত্মার কৃত রোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। মন্ত্রটি এইরূপ—"অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীংশ্চ সর্বাঞ্জম্ভয়ন্ত সর্বাশ্চ যাতু ধান্যা ধরাচীঃ পরাসুবঃ।"

মন্ত্রটি যজুর্বেদেও আছে। এই মন্ত্র ১০৮ বার উচ্চারণ পুরঃসর কুশদ্বারা রোগীকে ঝাড়িয়া দিতে হইবে, প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় পবিত্রভাবে। এবং এই মন্ত্র ১০৮ বার, অন্ততঃ ১০ বার দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্নান পানের জন্য ব্যবহার করিতে দিবে।

মন্ত্রটির দোষ গুণ ব্যবহারের পর বিশ্বাস্য বা অবিশ্বাস্য মত প্রকাশ করিলে ভাল হয়। শব্দশক্তি বিশেষতঃ মন্ত্রশক্তির প্রভাব অচিন্ত্য। কাহাকেও 'শালা' বলিলে অত্যন্ত কুপিত হয়। শালা শব্দের মধ্যে কোপের কি আছে? 'রন্ধনশালা', 'গোশালা', 'অশ্বশালা' এমন তো কত শালাই আছে, তবে কেন উপসর্গহীন নিরপদ্রব শালা শব্দে মানুষ কুপিত হয়।

শ্রীগুরু কৃপা করিয়া মন্ত্র দান করেন, মন্ত্র তো শব্দমাত্র, তাহার প্রভাবে সাধারণ মানুষও সাধু হয় কি প্রকারে?

জগাই মাধাই ইহাদের পরিবর্ত্তন হরিনাম প্রভাবে। হরিনাম শব্দমাত্র। কিন্তু যাঁহারা অহর্নিশ হরিনাম করেন—তাঁহারা ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারেন।

[পনের]

কেহ কাহারও অনিষ্ট বা ক্ষতি করিলে বা মর্মে আঘাত করিলে সে তাহার প্রতিকার করিতে না পারিলেও প্রতিকারের

একটা চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। এজন্য মানুষ মরণের পরেও যে অপকার করিয়াছে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে এবং যাহাতে সে কৃতকর্মের ফলভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপ একটি ঘটনা এইখানে বলা হইতেছে।

ভবানীপুরে স্যার আশুতোষের বাড়ীর দক্ষিণেই একটি ছোট তেতলা বাড়ী। সেই বাড়ীর সর্বোচ্চ তলার একটি ঘরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলাম—সেখানে রোগীর মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে যে সংবাদ শুনিয়াছিলাম,—তাহা সুবিস্তার হইলেও সংক্ষেপে বলিতেছি।

রোগীর বয়স ২৩৷২৪ হইবে, বাপ মা আছে- অল্প বয়সে বিবাহও হইয়াছে, একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া সুখে সংসার করিবার জন্য। অবস্থা বেশ সচ্ছল।

রোগী দেখার পর তাহার বাপ মাকে অন্য ঘরে যাইতে বলিয়া আমি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসক থাকিতে আমায় ডাকিলে কেন? কে তোমাদিগকে আমার কথা বলিল?

উত্তরে রোগী বলিল,—আমার চিকিৎসার আর কিছু বাকী নাই, অর্থ ব্যয়েরও অন্ত নাই। অগত্যা আমার মা তারকেশ্বরে হত্যা দিয়াছিলেন—বাবা তারকেশ্বর ঔষধপত্র কিছু না দিয়া আপনার নাম ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন,—তাই আপনাকে ডাকা হইয়াছে। আমি বিস্ময়ের উপর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ক্ষেপা তারকনাথের কি সবই ক্ষেপামি, শিবের অসাধ্য রোগ মানুষে ভাল করিবে? কেমন একটা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মনে মনে

বাবা তারকনাথকেই জিজ্ঞাসা করিলাম — বাবা, কেন তুমি এখানে আনিলে, কি বলিতে চাও, কিছুই তো আমি বুঝিতে পারিতেছি না ?

মনে হইল,—বাবা তারকনাথ বলিলেন এই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা কর এই রোগীই সব বলিবে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তুমি কি কিছু বলিতে চাও?' বড়ই আশ্চর্যের কথা, রোগীটি যেন কেমন একটা ভাবাবেশে বলিতে লাগিল—

"দেখুন,—এই যে আমার বাবা, ইনি বসিরহাটের একজন নামজাদা বড় উকালের মুহুরী, যেমন দেবতা, তেমনি বাহন। এমন কোন অকর্ম কুকর্ম নাই, যাহা ইহারা পারেন না বা করেন নাই। আমার এই জন্মের পূর্ব জন্মে আমাদের যা বিষয় সম্পত্তি মায় পৈতৃক ভিটা সবই ইহার প্রভু ও ইহার কৃপায় লোপ পাইয়াছে। কর্মের ফল নষ্ট হয় না, হাজে না পচে না, জন্মজন্মান্তর চলিতে থাকে। তাই বাবা তারকনাথের কৃপায় আমি ইহার পুত্ররূপে জন্মিয়াছি বাবার ইচ্ছায় সাজা দিতে হইবে। আমার বাবার নগদ টাকা কড়ি কম নয়, সে সবই আমার চিকিৎসার জন্য বড় বড় ডাক্তার ও বিলাতী দামী দামী ঔষধের জন্য খরচ করিতে হইয়াছে, আছে যৎসামান্য। তবে ভাবনা নাই, আমার মৃত্যুর পরে আবার সব ঠিক্ হইয়া যাইবে, মরিলে কি স্বভাব যায়? বাবা তারকনাথের ইচ্ছা, ইহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, আর কাহারো অপকার না করিতে পারে—সেইজন্য বাবা তারকনাথের ইচ্ছা আমার মৃত্যুর পর আমার এই যে নিঃসন্তান স্ত্রী থাকিবে সেই ইহার বাকীটুকু আদায় করিয়া লইবে, আমার মনে শান্তি হইবে, বাবা তারকনাথও

সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি আমায় বলিয়াছেন—ভয় কি? মরণের পর তুই আমার কাছে আসিবি।”

এইখানে আমার বক্তব্য—বাবা তারকনাথ মানুষের মত নিজের বক্তব্য অপরের মুখ দিয়া বলাইলেন বলিয়া মনে হয়, যেহেতু তাঁহার মানুষের মত স্থূল দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে বাবা তারকনাথকে সাধারণ মানুষের মত মনে করা সঙ্গত হইবে না। কেন না, মানুষেরই প্রকৃত স্বরূপ যখন মানুষে বুঝিতে পারে না, তখন দেবতা বিশেষতঃ দেবাদিদেব মহেশ্বরের স্বরূপ সাধারণ মানুষ কি করিয়া বুঝিবে? এইজন্য শাস্ত্রে আছে—যাঁহার স্বরূপ জ্ঞানের অতীত, তাহাকে জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে যাইও না।

যদি ভগবৎ কৃপায় কোন মানুষ নিজের জ্ঞানের গণ্ডীর পরপারে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার অজ্ঞেয় কিছুই থাকেনা, তিনি সবই জানিতে পারেন, দেখিতে পান, বলিতেও পারেন। সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা তাঁহাদেরই হয়, যাঁহার সুদীর্ঘ তপস্যালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ নির্মূল হইয়া গিয়াছে, যাঁহাদের দৃষ্টি সত্য ব্যতীত কিছুই দেখিতে পায় না। তাঁহাদেরই বাক্য যখন অসত্য হইতে পারে না- তখন দেবাদিদেব মহাদেব তারকনাথের স্বরূপ প্রভাব, ইচ্ছা ও কর্ম কে বুঝিবে? দুঃখের বিষয়, মানুষ নিজেকে মহেশ্বরের উপর ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, সেজন্য মানুষ বিশেষতঃ ধর্ম হইতে পৃথক্ স্বাধীন ভারতীয় মানুষ দেবতা সম্বন্ধে যাহা কিছু মনে করিতে পারে—বলিতেও পারে। পূর্বে লোকে বলিত—‘ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্’, আর এখন দেখা যায়—‘ধার্মিকো

রক্ষতি ধর্মং', যেহেতু এখন মানুষমাত্রেই প্রভু। প্রভুত্বের বিশেষত্ব সে 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ।' করা না করা বিপরীত বা অনুচিত করা সবই তার ইচ্ছার অধীন। সেজন্য যত কিছু হিন্দুর বিরুদ্ধ ধর্ম কর্ম আচার ব্যবহার সব কিছু করিলেও তাহার হিন্দুত্ব বিলুপ্ত হয় না, হিন্দু বলিয়া মুখে স্বীকার করিলে বা কাগজে লিখিলেই তাহাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

[ষোলো]

মরণে মানুষের দেহের বন্ধন কাটিলেও আত্মীয়স্বজন, স্বামী, পুত্র, স্বজন, বান্ধবগণের প্রতি স্নেহ ভক্তি ভালবাসার বন্ধন কাটে না। তাহার নাম আসক্তি বা প্রসঙ্গ।
শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে—

"প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনো কবয়ঃ বিদুঃ"।

এই প্রসঙ্গ বা আত্মীয়স্বজনের প্রতি মমতার বন্ধন—ইহা কখনও জীর্ণ হইয়া বিনাশ পায় না। কাজেই মানুষের মরণের আর মরণ হয় না। মনের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আবার আসিতে হয়। শরীর ধারণের সুযোগ সুবিধা না থাকিলে অশরীরী হইয়াই প্রিয় পুত্রপরিজনের কল্যাণ সাধনে রত থাকিতে হয়। তাহার একটি প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইতেছে।

আমার ভাই (বৈদ্যনাথ সেন) হাওড়ায় রেলে ক্লেমস্ অফিসে কাজ করিত। সে একদিন অফিস হইতে আসিয়া বলিল যে, তাহার একজন সহকর্মী গয়ায় বিদেহী পিতার পিণ্ডদান করিয়া সম্প্রতি

ফিরিয়াছে। সে তাহাকে (বৈদ্যনাথকে) বলিয়াছিল—"আমাদের বাড়ীতে একটি ফলন্ত বিল্ববৃক্ষ ছিল, কাল গয়া হইতে পিণ্ডদান করিয়া আসিয়া দেখি—মধ্যাহ্নে ঝড় ঝাপ্‌টা কিছুই ছিল না, অথচ গাছটিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, কে জানি না, পাড়ে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। ইহার একটা কারণ আছে। আপনি কাহাকেও যেন বলিবেন না।

আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন পাটনায় আমার বাবার মৃত্যু হয় কলেরায়। তারপর নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অতি কষ্টে লেখাপড়া করিয়া এখন এই রেলে চাকরী করিতেছি। বাবার কথাও আর মনে নাই। একদিন রাত্রিতে দেখি আমার বাবা আসিয়া যেন বলিতেছেন—'দেখ, এখন ত তুমি বেশ মানুষ হইয়াছ। চাক্‌রী-বাক্‌রী করিয়া কোন রকমে সংসার চালাইতেছ। তোমার মায়েরও কোন কষ্ট নাই। তুমি এখন গয়ায় গিয়া পিণ্ড দান করিয়া আইস, আমি এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করি।' তাহাতে আমি বলিলাম,—'আপনি যে বরাবর আমার সঙ্গে আছেন তাহার প্রমাণ কি?' তাহাতে তিনি অনেক কথাই বলিয়া বলিলেন—'তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিও, তুমি একবার সাঁতার দিতে গিয়া পুকুরে ডুবিয়া গিয়াছিলে, তখন সেখানে কোন লোক ছিল না, আমিই তোমাকে উদ্ধার করি।' পরে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম এই ঘটনা সত্য। তারপর আমি তখন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গয়ায় পিণ্ডদান করিলে আপনি যে মুক্তি পাইবেন তাহার প্রমাণ কি?' তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—'পিণ্ডদানের পর তুমি বাড়ী আসিয়া দেখিবে তুমি যে সময়ে পিণ্ডদান করিয়াছ, ঠিক সেই

সময়েই বাড়ীতে এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।"

এই কথা অনেক দিনের। এখনো আমার ভাই এবং সেই ভদ্রলোক কর্ম হইতে অবসর লইয়া এই জগতে বিরাজ করিতেছে।

এই সব সত্য ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—মানুষ মরিয়াও মরে না। তাহার কারণ, মনের বন্ধন। এইজন্য শাস্ত্রে আছে—

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তিমুক্ত্যৈর্নির্বিষয়ং মনঃ॥"

মানুষের দেহের সঙ্গে বন্ধনের হেতু মন এবং মুক্তির হেতুও মন। সেজন্য মানুষের মনের মধ্যে যত দিন সংসারের আসক্তি না কাটে, ততদিন তাহাকে পরলোক হইতে আসিয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। মনের আসক্তিরও সহজে নিবৃত্তি ঘটে না। কাজেই মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর নিবৃত্তি ঘটে না। আর জন্মগ্রহণ করিলে কত যে দুঃখ কষ্ট, লাভ লোকসান, স্বজনবিয়োগ জন্য শোক প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়, তাহা মানুষের ভোগলোলুপ মোহমুগ্ধ মন ভাবিয়া দেখে না, তাই মনে করে—এমন দিন কি চিরদিন যাইবে, আবার সুখের দিন আসিবে। কিন্তু একবারও কি ভাবে—সকল সুখ-সৌভাগ্যের ভোক্তা যে-আমি, আমার অস্তিত্ব কোথায়? মানুষের এই জন্ম-মরণ, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ দেখিয়া ভক্ত কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছিলেন—

"মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা
তুঁহু জগতারণ, দেব দয়াময়,
অতএ তোঁহারি বিশোয়াসা।

এ বিশ্বাস কি আর এখন আছে?

[সতের]

মানুষের জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি যেমন তিনটী অবস্থা, তেমনি মৃত্যু বা দেহান্তও একটি অবস্থা। একই ব্যক্তি যেমন জাগ্রৎ প্রভৃতি তিনটী অবস্থার সাক্ষী, তেমনি মরণের পরেও পূর্বাবস্থার সাক্ষী, কেননা, মৃত ব্যক্তির আত্মা মরণ বা দেহত্যাগের পরেও পরলোকের ও ইহলোকের কথা ভুলিতে পারে না—তাহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ণিত হইতেছে।

আমি একবার বর্দ্ধমানের এক সুপ্রসিদ্ধ উকিলের পুত্রের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। পুত্রটি সুদর্শন, সুশিক্ষিত যুবক। এম-এ, বি-এল্ পাশ করিয়া ওকালতী করিতেছিল। অল্পদিনেই প্রসার প্রতিপত্তি জমিয়া উঠে। সম্প্রতি রোগে শয্যাগত। বহুপ্রকার চিকিৎসা করা হইয়াছিল, ফল কিছুই হয় নাই। আমি রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিবার সময় একটি অপূর্ব অলৌকিক সংবাদ জানিতে পারিলাম।

সাধারণতঃ নাড়ী পরীক্ষার সময় চিকিৎসককে সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া তন্মনা হইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা এমনভাবে করিতে হয় যাহাতে রোগীর অন্তর্গত সমস্ত ভাবসকলের সহিত চিকিৎসকের চিত্তের ভাব এক হইয়া যায়। চিকিৎসক যোগযুক্ত হইয়া রোগীর সমস্ত অন্তের ভাব নিজেই অনুভব করিতে থাকেন, যেমন বেতার-যন্ত্রের কাঁটা ঘুরাইয়া আকাশের শব্দতলের সহিত যুক্ত হইয়া সঙ্গীত প্রভৃতি বহন করিয়া আনিতে পারে। প্রাচীন নাড়ীবিজ্ঞান-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—"নাড়ী জীবসাক্ষিণী", অর্থাৎ রোগী যে সকল শারীর ও মানস সুখ-দুঃখ সকল ভোগ করে,

তাহা সাক্ষ্য দেয় নাড়ী। সেজন্য প্রাচীন বৈদ্যগণ নাড়ী পরীক্ষায় অনেক কিছুই বলিতে পারিতেন। কিন্তু এখন তাহা অ-বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিত্যক্ত। আমি সেই প্রাচীন মতে নাড়ী পরীক্ষার জন্য চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিয়াছি—এমন সময় যেন একটি বালিকা বধূর আবির্ভাব অনুভব করিলাম। যদিও তাহার মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহার কথাগুলি যেন বাহ্যকর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকেই আন্তর কর্ণে শুনিতে পাইলাম। বালিকাটি করুণ স্বরে বলিতে লাগিল—

"এই যে রোগী, ইনি আমার স্বামী। বিবাহের পর ইহার কথাবার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে আমি এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতাম। ইনি সর্বদাই আমায় বলিতেন, 'স্বামি-বিরহে হিন্দু সতী স্ত্রী যেমন অবশিষ্ট জীবন ব্রহ্মচর্যে থাকিয়া পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হয়, তেমনি আমিও—তোমার যদি আগে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমিও অবশিষ্ট জীবন ব্রহ্মচারীর মত থাকিয়া মৃত্যুর পরে পরলোকে গিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব।' স্বামীর অকপট সত্য কথায় মুগ্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতেই স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অল্পদিন পরেই আমার মৃত্যু ঘটিল। দেহ গেহ সব কিছু ছাড়িয়া আমায় পরলোকে আসিতে হইল। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের মত আমি জাগিয়া উঠিয়া দেখি—আমার কিছুই নাই। ঘর-বাড়ী, স্বামী-শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, পিতা-মাতা, কিছু নাই। সে যে কি অবস্থা, তা আপনাকে কি বলিয়া বুঝাইব। আমি কিন্তু মন হইতে স্বামীকে বিদায় দিই নাই, সেজন্য সদাসর্বদা ইহার পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইনি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেন

না। এইরূপে কিছুকাল চলিতেছে, এমন সময় ইঁহার পুনরায় বিবাহ হইল। আমি সবই দেখিলাম। স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সবই দেখিতাম শুনিতামও। কিন্তু এক দিনও ইঁহার চিত্তে আমার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ বা শোকের চিহ্ন দেখিলাম না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও আমার জন্য ইঁহাকে ত্যাগ করিতে দেখি নাই। আমার সঙ্গে ইঁহার বিবাহিত জীবন যেন স্বপনের মত কাটিয়া গিয়াছে।"

আমি এই সংবাদ শুনিয়া রোগীকে নিভৃতে তাহার স্ত্রীর কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলাম। রোগী সবই স্বীকার করিয়া বলিল—"কি বলিব? বাপমায়ের আদেশ." বাপ-মা, অভিভাবক, গুরুদেবতার আদেশ কে কতটা শোনে বা মানে—সবই আমার জানা ছিল। আমি মৃত ও জীবিত উভয়ের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ বিতরণ করিয়া বিদায় লইলাম।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া এবং পরলোকতত্ত্বের আলোচনা করিয়া আমি বিনীতভাবে হিন্দুমনোভাবাপন্ন সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকটে নিবেদন করিতেছি।

পিতৃদেবো ভব মাতৃদেবো ভব।
গুরুদেবো ভব, শাস্ত্রদেবো ভব॥

একই সঙ্গে সুখদুঃখময় জীবনযাপন করিয়া মরণের পর তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করা, সব কিছু ভুলিয়া যাওয়া—কৃতঘ্নতা। শ্রীভাগবত বলেন—"কৃতঘ্নেন নাস্তি নিষ্কৃতিঃ"।

[আঠার]

পণ্ডিত শ্রীপদ্মদেব উপাধ্যায়, নিবাস বালিয়া জেলার শোনবর্ষা গ্রামে। ইহার নাম পূর্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

পণ্ডিতজী এখানে থাকিতেন, মোমিনপুরের ডায়মণ্ডহারবার রোডে রামচন্দ্র মাহাতোর বাড়ীতে। রামবাবুর বাড়ীটি একতলা হইলেও প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহের নিত্য সেবা —অতিথিসেবা হইত। পাশে একটি ধর্মশালাও ছিল, সেখানে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুভক্তগণ আসিতেন, থাকিতেন। কেহ দেবতার ভোগ গ্রহণ করিতেন, কেহ বা স্বহস্তে পাক করিতেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা এ সমস্তের যাবতীয় বিধিব্যবস্থার ভার ছিল পণ্ডিতজীর উপরে।

একদিন পণ্ডিতজী বলিলেন—"আমরা কয়েকজন বিদ্যার্থী বেদের কর্মকাণ্ড-অনুষ্ঠান সকল অধিগত করিয়া আচার্যের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিলাম। আমাদের সতীর্থ দ্বারভাঙ্গা নিবাসী সীতারাম বলিল—"আমি এখন দেশে ফিরিব না, কামাখ্যাধামে যাইব—তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকলও অধিগত করিব। কেননা বৈদিক কর্মের ফল তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মত সদ্য ফলপ্রদ নহে, যাহা গৃহস্থগণের একান্ত অভিমত। তা ছাড়া বেদের সঙ্গে তন্ত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহাও জানিবার ইচ্ছা।"

পণ্ডিতজী বলিলেন—"তারপর হঠাৎ একদিন কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আনন্দে জড়াইয়া ধরিয়া

বলিল, 'চল আমার সঙ্গে, আমি তোমায় তন্ত্রবিদ্যার সাক্ষাৎ পরিচয় কিছু দেখাইব।'

সীতারাম আমায় কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে লইয়া গিয়া উপস্থিত হইল। তখন একটা মড়া পুড়িতেছিল,—কি নিবিড় ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ধূমপুঞ্জ। যাহারা সৎকার করিতেছিল তাহাদের সকলেরই চোখে জল, শোকে নয়—ধোঁয়ায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি জানিলে কি করিয়া?

সে বলিল—প্রত্যক্ষ করিতে চাও? এক সের গব্যঘৃত খরচ কর।

আমি বলিলাম—কে মরিয়াছে, কি করিয়াছে, তার সদ্‌গতি না দুর্গতি হইতেছে—তার জন্য আমি ট্যাঁকের পয়সা খরচ করিতে যাইব কেন?

সীতারাম বলিল—তাহা হইলে তোমার বেদের সঙ্গে তন্ত্রের সম্বন্ধ দেখা যাইবে না, জানাও যাইবে না।

অগত্যা রাজী হইলাম। সীতারাম আমাকে সঙ্গে লইয়া বাজার হইতে এক টাকায় একসের গব্যঘৃত কিনিয়া আনিল।

সীতারাম শ্মশানে আসিয়া বলিল—"আমি তোমার চোখে একটা কাজল পরাইয়া দিব, কেননা, এ চোখে সে দৃশ্য দেখা যাইবে না। সীতারাম আমার চোখে কাজল পরাইয়া দিয়া মুর্দাফরাশের একটা কোদালের বাঁটে বসাইয়া দিল। বলিল—যেমন কর্ম তেমনি আসন দরকার।

সীতারামের কৃপায় আমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া দেখিলাম—চিতার চারি পার্শ্বে অসংখ্য বীভৎসদর্শন ভূত-প্রেত জ্বলন্ত চিতা

হইতে, মৃতের দেহ হইতে অর্দ্ধপক্ক মাংস সকল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে, তাহাদের কি চিৎকার, কি কোলাহল। মনে হইল এই কি যমালয়?

সীতারাম ঘৃতভাণ্ডকে মন্ত্রপূত করিয়া চিতায় ঢালিতে গেল, তখন সেই মৃতের শ্মশান-বন্ধু সকল ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতভাণ্ডটি কাড়িয়া লইয়া বলিল—"কিছুতেই ঘৃত ঢালিতে দিব না, তুমি মৃতের অসদ্‌গতি করিবে—ভূত বানাইবে।"

সীতারাম অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কিছু করিতে পারিল না, তখন সে মৃতের জীবদ্দশায় তাহার যাবতীয় দুষ্কর্মের কথা বলিল। তখন তাহারা বলিল, 'তবে দাও।' সীতারাম চিতায় ঘৃত দিতেই ভূতপ্রেতগণ কে কোথায় ছুটিয়া পলাইল। তখন পুঞ্জীভূত ধূম্রসকল উর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল।

সীতারাম বলিল—তুমি যে বেদে পড়িয়াছিলে—"ধূমো ভূত্বা পর্জ্জন্যো বেত্তি পর্জ্জন্যো ভূত্বা বর্ষতি, [বর্ষণাৎ শস্তসম্পৎ" ইত্যাদি, সত্যই তাই। ঐ পুঞ্জীভূত কালো ধোঁয়ায় যে মেঘ হইত সেই মেঘ আকাশে বর্ষণ করিয়া শস্তসম্পদের ক্ষতি করিত। যদিও কিছু শস্যসম্পদ হইত তাহা দেবতার ভোগে লাগিত না।"

পণ্ডিতজী বলিলেন—সীতারামের এই তন্ত্রবিদ্যার নৈপুণ্য দেখিয়া আমি একজন সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগীর নিকট গিয়াছিলাম, তিনি নবরাত্রের সময় সিদ্ধপীঠ কালীঘাটে আসিয়াছিলেন। তিনি আমায় কৃপা করিয়া বলিলেন—"আগে তোমায় কিছু সিদ্ধাই দেখাই, তোমার বিশ্বাস হউক, তারপর দশমহাবিদ্যা শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া একদিন মন্ত্রপূত কতকগুলি মটরদানা উঠানে ছিটাইয়া

দিলেন, কয়েকটা পারাবত আসিয়া খাইতে লাগিল এবং খাওয়ার পরেই পঞ্চত্বলাভ করিল। তখন তিনি বলিলেন—এইবার বাঁচাইয়া দিই দেখ। তান্ত্রিকযোগী তখন মন্ত্রপূত করিয়া কতকগুলি মটরের দানা তাহাদের উপর ছিটাইয়া দিলেন, সকল মৃত পারাবতই বাঁচিয়া উঠিল—উড়িয়া চলিয়াও গেল। তখন সেই যোগীপুরুষ বলিলেন—এক একজন সাধু মহাপুরুষ যোগী ফকির দীর্ঘ সাধনা করিয়া যে মন্ত্র লাভ করেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবে তাঁহার শিষ্যগণও সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। মন্ত্রশক্তি অচিন্ত্য, আর তাহার প্রদাতা গুরুগণের কৃপাও অচিন্ত্য। অবিচারে গুরুসেবা করিলে অসাধ্য সাধন করা যায়।

হিন্দুকন্যার বিবাহ হইলে তাহার স্বামী যেমন সকল ভার গ্রহণ করেন, তেমনি মানুষ সমাশ্রিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলে গুরু তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করেন। অতএব যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার আর ভাবনা কিসের?

শ্রীগুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।

[উনিশ]

মরণের পরে মানুষ লোকান্তরে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে, আবার মরিবার জন্য। কেন না, মরণের মরণ নাই। মরণের মরণ হয় তখনই, যখন তাহার কর্মফল নিঃশেষ হইয়া যায়—ভগবৎ-কৃপায় শ্রীগুরুর চরণে সমাশ্রিত হইয়া নতুবা,—"মা ভুঙ্‌ক্তে ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।" মানুষের জন্ম

ও মৃত্যু সবই তাহার কৃতকর্মের ফল। এই কর্মফলে মানুষ যেমন বদ্ধ হয়,—তেমনি মুক্তও হয়। মুক্ত হইবার সময় সে যখন গর্ভ-কারাগারে বদ্ধ থাকে, তখন প্রার্থনা করিয়া বলে—

যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম শুভাশুভম্
একাকী তেন দহ্যেহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
যদি যোন্যাঃপ্রমুচ্যেহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্॥

ঠাকুর,—পরিবার প্রতিপালন করিতে গিয়া কত শুভ ও অশুভ কর্ম করিয়াছি, তাহার শেষ নাই, তাহারা সবাই চলিয়া গিয়াছে নিজের নিজের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া, আমিই কেবল স্বকৃত কর্মের ফলে এই গর্ভ-কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছি। যদি এখান হইতে মুক্ত হই, তবে হে মহেশ্বর,—আমি তোমার চরণে প্রপন্ন হইব।

বিপন্ন হইয়া সকলেই ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হয়। বিপদ কাটিয়া গেলে কে কার প্রপন্ন হয়? কর্মফল যমের মত। সে ছাড়ে না। সে আবার নিজের পাওনা গণ্ডা কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইবার জন্য তাদৃশী বুদ্ধিপ্রবৃত্তি দেয়, যাহাতে অহংকারের বশে এমনই কর্ম করিতে হয়, যাহার ফলে স্বকৃত কর্ম-ঋণের পরিশোধ হয়। এইজন্য একজন মহাপুরুষ বলিতেন, "ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিও—ঠাকুর, কৃপা করিয়া আমার বুদ্ধি ফিরাইয়া দাও, আমা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।" সাধারণ মানুষের কাছে ইষ্ট, গুরু, ভগবান্ কিছুই নাই, আছে কেবল তার নিজের বুদ্ধি। সেই বুদ্ধির জন্যই সে "অকৃত্যং মন্যতে কৃত্যম্"—যাহা করা উচিত নয় তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। সকল ধর্মকে ত্যাগ করিয়া সে নিজেকে ভজনা করে। দেবতার কাছে বিপদ্-মুক্তির জন্য হত্যা দিয়া তাঁহার

আদিষ্ট ঔষধের নিজের বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া বিপন্মুক্ত হইতে গিয়া বিপদকে ডাকিয়া আনে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত ঃ—

ডাঃ যতীশচন্দ্র গুপ্ত, প্রাক্তন ডিরেক্টর ট্রপিক্যাল মেডিসিন, একদিন বলিলেন—"দাদা, একটি অত্যন্ত গরীব রোগী, পিতা প্রবাসীতে সামান্য বেতনে কর্ম করে, অতি সামান্য বেতন। পোষ্য স্বয়ং, স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ। একখানি ঘরেই সকলে বাস করে। পুত্রটি পীড়িত, আমি বহু চেষ্টা করিয়াছি কিছুই হয় নাই, আপনাকে একবার দেখিতে হইবে, দর্শনী ও ঔষধের মুল্য কিছুই দিতে পারিবে না। আমি বিস্মিত হইলাম ডাক্তারের করুণা ও মানুষের পূর্বকৃত কর্মের ফল দেখিয়া। এই জন্যই বোধহয় চণ্ডীতে আছে—

"চিত্তে কৃপা, সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট্বা,
ত্বয্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়েঽপি।"

—মা তুমি মানুষের কৃতকর্মের ফলে যেমন রোগ দিয়াছ, তেমনি কৃপাপরবশ হইয়া চিকিৎসকও দিয়াছ, যাহার জন্য ডাঃ গুপ্তের আজ আমার নিকট বিনীত অনুনয়।

অতঃপর আমিও যথাজ্ঞান চিকিৎসা করিতে লাগিলাম, প্রাক্তন কর্মফলও রোগরূপে আসিয়া স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিল।

একদিন ডাক্তার গুপ্ত আমায় বলিলেন,—"দাদা, মানুষ বিপন্ন হইলে তাহার বুদ্ধি স্থির থাকে না। সেইজন্য রোগীর পিতা ধারধোর করিয়া যোলটাকা ফী দিয়া একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আনিয়াছিলেন, ভয়ে আপনাকে কিছু বলিতে পারেন নাই। সেজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যে

মূল্যবান ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তিনি বিনামূল্যে দিতে পারিবেন না বলিয়াছেন, তা আপনাকেই বিনামূল্যে দিতে হইবে। আর তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন, একটা বোকা পাঁঠাকে ঐ ঘরে রাখিয়া দিতে, যাহার গায়ের গন্ধ খুব উৎকট হইবে। তা' দাদা, ঐ তো একখানি ঘর, রোগীকে লইয়া চারজন বাসিন্দা, অধিকন্তু অতি নির্বোধ একটি যুব ছাগ। তাহাকে খাওয়াইবে কি করিয়া আর চিনিবেই বা কি করিয়া?" আমি ডাক্তারবাবুর অনুরোধে সমস্ত ঔষধই দিবার ব্যবস্থা করিলাম। পারিলাম না বোকা পাঁঠার ব্যবস্থা করিতে। বলিলাম—ইহার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয়ের শরণ লইতে।

ইত্যবসরে রোগীর স্নেহকাতরা জননী বাবা তারকেশ্বরের নিকট পুত্রের রোগমুক্তির জন্য হত্যা দিলেন। বাবা তারকনাথ সদয় হইয়া স্বপ্নে আদেশ করিলেন, রোজ একটা করিয়া তিনদিন তিনটা বট ফল গঙ্গাজলে বাটিয়া আমার নাম করিয়া খাওয়াইয়া দিস্, ভাল হইয়া যাইবে।

দেবতার আদেশ অপেক্ষা নিজের বুদ্ধি বড়,—যাহার জন্য মহাপুরুষ আদেশ করিয়াছিলেন—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিও আমার বুদ্ধি ফিরাইয়া দিও, আমার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করিও। সেই জন্য বুদ্ধিমান রোগীর পিতা আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়— বটফল তো বিষ নয়? আমার স্ত্রী তারকনাথের কাছে হত্যা দিয়াছিল, তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন বটের ফল গঙ্গাজলে বাটিয়া খাইতে দিতে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি বটফল বিষ নয় তো?

শাস্ত্রে আছে—দৈবে চ ভেষজে চৈব, যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। দৈব ঔষধ খাওয়াইয়াছিল কি না জানি না, তবে শুনিয়াছিলাম ছেলেটি লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে যেমন বলা হইয়াছে, শতকোটি কল্পেও কর্মফলের ক্ষয় হয় না, তেমনি 'মদ্‌ভক্ত্যা তদ্‌ বহুস্বল্পং বিপরীতমতোঽন্যথা।' ভগবদ্‌ ভক্তিতে কর্মফল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়। অন্যথা অভক্তিতে তাহার বিপরীত হয়। মানুষ যখন কোন উপায় নাই দেখিয়া দৈব করে, তখনও সে নিজের বুদ্ধিকে অহংকারকে ত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য মহর্ষি পুনর্বসু আত্রেয় বলিয়াছেন—

"ন কর্মণা নৈব মনোমতিভ্যাম্
ন চাপ্যহংকারবিকারদোষৈঃ"
"আত্মা কদাচিন্ন বিযুক্তরূপঃ।"

মানুষ দেহ ত্যাগের সময় আত্মীয়স্বজন ধনদৌলত সব কিছু ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু স্বকৃত কর্মফল মন বুদ্ধি অহংকার জন্য যতকিছু বিকার সে সকল কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। সেজন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বশে দেবতা গুরু সাধুসন্ত সকলের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলে, "ওরা আর কি জানে?" তাহার বিষময় ফল সে নিজেই ভোগ করে; তথাপি চৈতন্য হয় না। গরুর মত পুনঃপুনঃ চর্বিতচর্বণ করিতে করিতে 'ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম, লভন্তে নৈব নিষ্কৃতিম্।' জন্ম জন্মান্তর যাইতে আর আসিতে থাকে, মুক্তি আর হয় না। তবে সে যদি নিজের কর্মের ফলে দুঃখ দারিদ্র্যের হেতু নিজেকেই স্থির করিয়া

সৎকর্মের দ্বারা সদাচারের দ্বারা সৎসঙ্গের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে তাহা হইলে :—

সৎকর্ম পরিপাকাৎ তে করুণানিধি নোদ্ধতা
প্রাপ্য জীবতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্।

নদীতরঙ্গে আক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত পিপীলিকা যেমন স্নানার্থী সাধুসন্তগণের করুণার ফলে তীরস্থিত তরুতলে আশ্রয়লাভ করিয়া বিশ্রামলাভ করে—তদ্রূপ মানুষও যদি সাধুসন্তের করুণা পায় তাহা হইলে কর্মফলে জন্মমরণের অধীন হইয়া তাহাকে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয় না, শ্রীগুরুর চরণে সমাশ্রিত হইয়া সে চির বিশ্রাম লাভ করে।

এই চিরবিশ্রামের প্রবৃত্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই বিধি-নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃত পন্থা দুঃখময় কর্মফল ভোগের দ্বারা নিবৃত্তির জন্ম জন্মান্তর, নতুবা জীবকুলকে আকুল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিবার জন্য করুণাময় বিধাতা জন্মমৃত্যুর এই অকরুণ বিধান সৃষ্টি করেন নাই। জগতে রোগ যেমন আছে, তেমনি ঔষধও আছে। নিজের বুদ্ধি যেমন সকল দুঃখ ও রোগের কারণ হয়, তেমনি পরের বুদ্ধিও সকল সুখ ও আরোগ্যের হেতু। যদি মানুষ অন্ততঃ নিজের বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরের বুদ্ধিকে আশ্রয় করে তাহা হইলে সেই পরও পরাৎপরের কৃপার আধার হইয়া তাহার সকল দুঃখের মূল ভবরোগ হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না কেন ?

[কুড়ি]

এবার একটি অদ্ভুত কথা বলিতেছি—বিশ্বাস করা বা না করা পাঠকের অনুগ্রহ; কেননা মনের মত হইলে মিথ্যাও সত্য হয়, আবার সত্যও হয় মিথ্যা। ইহাই সাধারণের জন্য প্রকৃতির দান।

শেষ রাত্রি—লোক দেখিলাম না, কিন্তু কথাগুলি বেশ সুস্পষ্ট। যথা—"তোমাদের এই স্থূল জগতের মত যদি এই সূক্ষ্ম জগতে অর্থাৎ পরলোকেও সংবাদপত্র থাকিত, আর তাহা যদি তোমরাও পড়িতে পারিতে, তাহা হইলে দেখিতে কত অদ্ভুত সংবাদ। মরণের পর আমি এখানে খুব বেশী দিন না হইলেও অনেক দিন আসিয়াছি। আহার, নিদ্রা, বাসস্থান বা নির্দিষ্ট কোন একটা কর্ম, অর্থাৎ চাকুরী—কোন কিছুরই ভাবনা নাই, বেশ স্বাধীন —স্বতন্ত্র। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার রাজ্যে একটি অপূর্ব বস্তু দেখিলাম। চিন্তা, মনে হয়, মানুষ মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করিয়া যে-মনকে সঙ্গে লইয়া আসে—সেই-মনেরই এই কার্য। এই চিন্তার দুইটী গতি দেখা যায় - একটি অধোমুখে, অপরটি ঊর্দ্ধমুখে। চিন্তার অধোমুখী গতি থাকে তাহাদেরই, যাহারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও সংসার প্রভৃতির জন্য চিন্তিত এবং যাহারা অহংকারের বশে নিজেকে মালিক করিয়া সব কিছু করিয়া আসিয়াছে, আর ঊর্দ্ধমুখী চিন্তার গতি দেখা যায়—যাহারা সংসারের নানাপ্রকার দুঃখ-দুর্ভাগ্য, শোক-তাপ প্রভৃতির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল তাহাদের। যাহাদের চিত্তের অধোমুখী প্রবৃত্তি—তাহাদের কেহ কেহ এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও অবস্থান করে, অথবা স্থূল জগতে ইহলোকে ফিরিয়া গিয়া বিভিন্নভাবে জন্মগ্রহণ করে। আবার যাঁহাদের চিত্ত-বৃত্তির গতি ঊর্দ্ধমুখী তাঁহারা যেখান হইতে আসিয়াছেন সেখানে ফিরিয়া না গিয়া এমন একটা স্থানে যাইতে চান, যেখানে চিরবিশ্রাম, চিরশান্তি। ইহা যাঁহারা চান—তাঁহারাই ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম স্থানে বা লোকে যান। সেজন্য এই পরলোকে অনেক সর্বস্বত্যাগী

পরহিতৈষী সাধু আছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি দিয়া চিত্তের মালিন্য দূর করিয়া দিয়া থাকেন। স্থূল জগতের সহিত সূক্ষ্ম জগতের বা ইহলোকের সহিত পরলোকের যে একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা আমি জানিতাম না—মানিতামও না অথচ তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমিই তোমাকে আচার্য নগেনবাবুর নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া আমাকে অবিশ্বাসী বলিয়া—তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে দেন নাই। এখন দেখিতেছি মানুষের অন্তরের ভাব মানুষে বোঝে না।

"আজ মরণের পর এখানে আসিয়া যে স্থান ও যে অবস্থা লাভ করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজের কৃপা। আর যে মহাপুরুষ আমাদিগকে সমাশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অপার করুণা, নতুবা এই স্থানে এই অবস্থা আমাদের মত লোক কখনই লাভ করিতে পারিত না। এইখানে একটা কথা তোমায় বলিয়া রাখি—গৃহস্থ ধনবান ব্যক্তিগণের স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যেমন থাকে, তেমনি সর্বস্বত্যাগী মহর্ষিকল্প সাধু মহাত্মা আচার্যগণের চিরসঞ্চিত তপোরাশির পুণ্যফল তাঁহার শিষ্যগণ ভোগ করিয়া থাকে, নতুবা আমার এই অসামান্য সৌভাগ্যের কারণ কি? বোধ হয় তোমার মনে আছে—হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাইবার সময় তুমি বলিয়া দিয়াছিলে—"কুম্ভস্নানের সময় আমার হইয়া একটা ডুব দিয়া দিও।" আমি ও-সব মানিতাম না বলিয়া যে কয়দিন ছিলাম, একদিনও গঙ্গায় স্নান করি নাই—তোমার হইয়া ডুবও দিতে পারি নাই, অথচ আমার এই অবস্থা। আমি এখানে বহু আশ্রম

ও আশ্রমবাসীদিগকে দেখিয়াছি, তাঁহারা বহু বহু সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু সকলেই দীক্ষিত। শ্রীগুরুর কৃপায় অসাধ্য সাধন হয়। তবে সকল গুরু সমান নহে, বিশেষতঃ যাহাদের চিত্তে বাসনা কামনার গন্ধ আছে—তাঁহাদের শিষ্যগণের এরূপ অবস্থা হয় না। তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে—আমাদের স্বামীজী মহারাজ পূর্বে কাহাকেও দীক্ষাদান করেন নাই, এমন কি নেপালের মহারাণীও বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া তাঁহার নিকটে সমাশ্রিতা হইতে পারেন নাই।

"আমার মনে হয়, মানুষের সকল কল্যাণের মুলে অহংকার—যাহাকে বলে নিজেকে মানা। এই নিজেকে মানার যে কি কু-ফল, তাহা এখানে না আসিলে বুঝিতে পারা যায় না। গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র সামান্য একটা কথা মাত্র। তাহা কেতাবেই লেখা আছে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেই কথা আবৃত্তি বা জপ করিলেও কিছুই হয় না, কিন্তু শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের মুখে উচ্চারিত সেই কথা, সেই মন্ত্র যে অপূর্ব অসামান্য শক্তি প্রকাশ করে তাহা বলা যায় না। চিরকাল যুগযুগান্তর ধরিয়া সঞ্চিত পাপরাশির গাঢ় অন্ধকার শ্রীগুরুর কৃপা-কটাক্ষের জ্যোতিঃকণার দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। কেহ বলে না—আমরা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এই অন্ধকারময় চিত্তগুহায় বাস করিতেছি—আমাদের এখানে থাকিবার অধিকার আছে, তবে বর্ত্তমান গুরুসম্প্রদায়ের কিরূপ হয়, সে সংবাদ রাখি নাই। আর একটা কথা আমার মনে হয়—বিশ্ব বিরাট সংসারের পিতামাতা পুরুষ ও প্রকৃতি—জীবন ও মরণের মত একই সূত্রে দুইটিকে গাঁথিয়া মানুষকে দিয়াছেন — একটি ভোগ অপরটি ত্যাগ। উভয়ের ভারসাম্য রাখিয়া যাঁহারা চলিতে পারেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্ত

সংসারী মানুষ, তাহাও বড় একটা দেখা যায় না। সকলেই একটাকে ছাড়িয়া অপরটাকে ধরে। তাহার ফলে অধোগতি বা নরক এবং ঊর্দ্ধগতি বা স্বর্গাদি ক্রমে পরমপদ। তুমি গীতাখানি ভাল করিয়া নিত্য পাঠ করিবে, শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার মধ্যে প্রবেশ করিবে না। করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে প্রকৃত পথপ্রদর্শক গুরুর দেখা পাইবে—তিনিই তোমার পথপ্রদর্শক হইবেন। গীতায় দৈব ও আসুর সম্পৎবিভাগ দেখিয়াছ তো? ত্যাগ ও ভোগের ভারসাম্য রাখিতে হইলে—শ্রীগুরুর চরণে সমাশ্রিত হইয়া শ্রীভগবানের কিঙ্কর বা দাস হইতে হয়। আরও অনেক উপায় আছে দার্শনিকগণের মতে, তার মধ্যে ভক্তিদর্শনের শরণাগতির পথই ভাল, তাহাতে পতনের সম্ভাবনা নাই, কর্মফলেরও বন্ধন নাই। মালিকের আদেশে কর্মের ফল মালিকে ভোগ করে – ভৃত্যে করে না। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম এ সব বিচার ভৃত্যের নহে, তোমার "যথাদেশং করবাণি"। সেইজন্যই গীতায় শ্রীভগবানের চরম বাক্য—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অর্থাৎ সকল অধর্ম তো তুমি নিজের বিবেক বুদ্ধিতে ত্যাগ করিবেই। অপর ধর্ম – তাহাও তোমার বন্ধনের হেতু! তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় – দাসত্ব, শরণাগতি, অচিৎবৎ পারতন্ত্র্য। এই যে তুমি লিখিতেছ, অচেতন কলম তোমার দাস। অথচ লেখাকার্য কলম ব্যতিরেকে হয় না, তাই বলিয়া কলম কি তোমার লেখার ভাল-মন্দের জন্য দায়ী হইবে? শ্রীভগবানের এমন যে অভয়-বাণী,

সেই গ্রহণ করিতে পারে না, যাহার চিত্তে অহংকার বা মালিকানার দাগ থাকে। যে মন বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র হেতু, যাহার জন্য মানুষ জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বিশ্রামের নাম নাই—সেই মনের মধ্যে তিনটী গুণ আছে--একটি পরম বিশুদ্ধ সকল মুক্তির আধার সত্ত্বগুণ, আর একটি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত যাবতীয় দোষের আধার তমোগুণ। এই পাপ ও পুণ্য, আলো-আঁধারের মধ্যে আর একটি গুণ আছে 'রজোগুণ', যাহার অধিষ্ঠাত্রী অহং বা তুমি। এই তুমিকে আমি বানাইয়া লোকে তমোময় প্রদেশ—ভোগের দিকে লইয়া যায়, আর সাধুপ্রকৃতি সজ্জনগণ পরম মুক্তির জ্যোতির্ময় প্রদেশ—ত্যাগের রাজ্যে লইয়া যায়। তাহারও নেতা বা চালক রজোগুণের অধিষ্ঠাতা তুমিই, তখন সে রজোগুণের মধ্যে দাসত্ব থাকে, সত্ত্বগুণের অধীন হইয়া মনে করে আমি দাস, আমি কিঙ্কর। এই রাজ্যে আমি এখন যেখানে আছি—ইহার মধ্যে অর্থাৎ দেহত্যাগের পর, সত্ত্ব বা মনের রাজ্য। এখানে দুই সম্প্রদায়েরই লোক আছে—ত্যাগী ও ভোগী। ভোগীরা পার্থিব ভোগের জন্য পৃথিবীতে চলিয়া যায় আর ত্যাগীরা স্বর্গ বা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য মুক্তির কামনায় শ্রীভগবানের দাস হইয়া অবস্থান করে। যে সকল ঋষি মহর্ষি, সাধু, ভক্ত পূর্বে দেহধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া বিবিধ সৎকর্ম ও সৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা পৃথিবীতে জনগণের কল্যাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও বিনাশ হয় নাই। তাঁহারাও এখন মরদেহ ত্যাগ করিয়া অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া পৃথিবীর জনগণের কল্যাণের জন্য কি করেন আর কি না করেন, তাহা সাধারণ মানুষে

জানে না। গীতায় আছে—বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেন; উদ্দেশ্য—সর্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সন্তোষের জন্য। কেননা, তাঁহারই আদেশে চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাকৃতিক নিয়ম সকল যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়া লোকের সুখ সম্পদ বৃদ্ধি করিতেন, আর কৃতজ্ঞ লোকগণও দেবতার আরাধনার দ্বারা শ্রীভগবান বিশ্বপতিরই সন্তোষ সাধন করিতেন। আমার মনে হইয়াছে কলিকালের যজ্ঞ পরোপকার—লোকগণের প্রতি প্রেম ভালবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি এবং পরলোকগত ঋষি, মহর্ষি, দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব ও পিতৃপুরুষগণের প্রীতি ও তৃপ্তির জন্য যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধতর্পণাদি করা। যাহার ফলে এই পরলোকবাসী ঋষি মহর্ষি দেবতা ও পিতৃপুরুষগণ পরিতৃপ্ত হইয়া জগতের কল্যাণ করিতে পারেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, মানুষের ভোগাভিলাষী চিত্তকে ত্যাগাভিলাষী করিতে হয়, তাহা করিতে হইলে মানুষকে সংযত হইতে ও বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে ত্যাগাভিমুখা করিতে হইবে। বর্ত্তমানকাল তাদৃশ ভাবের পোষক নহে—যেমন গ্রীষ্মকাল শস্য সম্পত্তির পোষক হয় না, কিন্তু হেমন্ত বা শীত ইহার উপযুক্ত কাল। তথাপি চেষ্টা করিতে হয় জগতের পিতামাতার প্রীতির জন্য। 'ফলদাতা হরিঃ স্বয়ম্'।"

আশ্চর্যের বিষয়—বিধুর আগমন ও তিরোধান আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কেমন একটা চিত্তের ভাবান্তরমাত্র ঘটিয়াছিল। এইরূপ ভাবান্তর বোধ হয় অনেকেরই—যাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে ভগবদ্-আরাধনা করেন, তাঁহাদের হইতে পারে। কেননা শ্রীভগবান্ ভগবদারাধনায় সমাহিত চিত্তে ভাবরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে পরম শান্তিময় আনন্দ প্রদানের দ্বারা কৃতার্থ করিয়া থাকেন—ইহাই আমার ধারণা।

পরিশিষ্ট

মানুষ যে মরণের পরে আর ফিরিয়া আসে না— এ ধারণা একান্ত ভ্রান্ত এবং ইহাই মানুষের মরণজন্য শোকের মূল কারণ তাহা বলা যায়।

মানুষ মরণের পরে ফিরিয়া আসে, তাহার কয়েকটি প্রমাণ এই 'মরণের পর' নিবন্ধে দেখা যাইবে। তাহা ছাড়াও আরো অনেক প্রমাণ আছে এবং এখনও অনেক সংসারী গৃহস্থও জানেন, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন আবার ফিরিয়াছে। কিন্তু তাহারা কেহই মুখে বলে না—স্বীকারও করে না, কারণ—যে আসিয়াছে তাহাকে চিনিতে পারিলে সে আর থাকিবে না, চলিয়া যাইবে।

মরণের পর আবার যাহারা কর্মবশে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের আর পূর্বের মূর্ত্তি থাকে না, সম্পূর্ণ নূতন কলেবর ধারণ করে। চাল-চলন ও কথাবার্ত্তার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। তথাপি মা-বাপ তাহাকে চিনিতে পারে—তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনে হয়—এই জগৎ বিশ্বনিয়ন্তার একটি রঙ্গশালা। এখানে যে একবার রাজা সাজিয়া আসিয়াছিল, সে এবারও রাজা হইয়া আসিবে, তাহার প্রমাণ কি? এবার সে হয়তো ভৃত্য হইয়া আসিবে। তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার প্রভৃতিও। 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, তদা তদাব-

তীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্'—যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে, তখনই আমি আসিয়া শত্রু বিনাশ করিব, কিন্তু সকল বারেই শ্রীকৃষ্ণ হইয়া আসিব—এ কথা তো বলেন নাই, তাহা হইলে এবারে তাঁহার নবদ্বীপে পতিতপাবন হইয়া আসা চলিত না।

মানুষ পুনঃ পুনঃ একই সংসারে জন্মগ্রহণ করিলেও প্রতিবারে তাহাকে বিভিন্ন প্রকার মুর্ত্তি ধরিতে হয় এবং তদনুরূপ কর্মসকলও করিতে হয়, সেইজন্য কেহই যেন মনে না করেন—মরা মানুষ ফেরে না, ফিরিলেও একই বাড়ীতে ফেরে না। বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির লীলা —আর মানুষের কর্মবন্ধন আত্মীয়স্বজনের প্রতি আকর্ষণ। বহিঃ-প্রকৃতির মাধ্যাকর্ষণই মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না, আর এই আন্তরপ্রকৃতির আকর্ষণ যাহা অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এইজন্য শ্রীভগবান যখন গোলোক ত্যাগ করিয়া পাতালের দ্বারে দ্বারী হইলেন—তখন তিনি প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন—চল তুমিও আমার সঙ্গে। তোমার তো কর্মবীজ আসক্তির বন্ধন কাটে নাই। সেখানে "মদ্দর্শন মহাহ্লাদধ্বান্তকর্ম-নির্বহণ"। আমি নিরন্তর দর্শনের ফলে যে তোমার মহান্ আহ্লাদ উপস্থিত হইবে, তাহাতেই কর্মবন্ধন ক্ষয় পাইবে।

প্রহ্লাদের মত ভক্ত, বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সমীপে যাঁহার নিরন্তর বাস, তাঁহার যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষ, যাহারা বাসনা কামনার শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ, তাহারা দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই কি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে? তাহা হয় না। তবে যদি পরলোকগত মানুষ ইহলোকে আসিলে সংসারে তাহার অনুকূল ভাবের অভাব হয়, তাহা হইলে আর আসে না।

ব্যর্থমনোরথ হইয়া অন্তরীক্ষে নিরাশ্রয় আশ্রয় গ্রহণ করে। কেহ বা পরিত্যক্ত আত্মীয়স্বজনের প্রতি বিরূপ হইয়া বহু অনিষ্ট সাধন করে—ইহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্রের উপদেশ—"ধর্ম চর পিতৃদেবো ভব"।

মরণের পর যে কত রাজ্য বা লোক আছে, তাহার প্রথম সংবাদ আমি পাই আচার্য নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট। তিনি সেই সব রাজ্য ও লোকের অনেক সংবাদ আমায় বলিয়াছিলেন, আমি সে সব শুনিয়াছিলাম মাত্র—বিশ্বাস করি নাই। কেননা, মানুষমাত্রের একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে যে, সে নিজেকে অভ্রান্ত ও অনেক কিছু জানে বলিয়া যেরূপ মনে করে এবং বিশ্বাসও করে, সেরূপ অপরে নহে। তাহা ছাড়া, যে যত অনভিজ্ঞ, সে তত অভিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসী হয়। আমি সেই দলের একজন।

তারপর "মৃত্যু-রহস্য" এবং "ওপারের কথা"র লেখক সাধু নৃপেন্দ্র নাথ দে মহাশয় আমাকে মৃত্যুর পরে অবস্থিত রাজ্য বা লোক সকলের মধ্যে পাঁচটী রাজ্য বা লোক, তাঁহার ভাষায় স্বর্গ, আমায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন—"মৃত্যুর অব্যবহিত পরের রাজ্য সংশোধন-রাজ্য, যাহাকে লোকে বলে যমলোক বা যমের রাজ্য তাহা তোমাকে দেখান হইল না, ভয় পাইবে বলিয়া। সাধারণতঃ ইহজগতের দুষ্কৃতকারীগণ মরণের পরেই যমদূতগণ কর্তৃক সেখানে নীত হইয়া কর্মানুসারে বিবিধ প্রকার যাতনা ভোগ করে। করুণাময় ধর্মরাজ যম সেখানে দুষ্কৃতকারী-দিগকে কর্মানুসারে দুষ্কর্মের ফলভোগ করাইয়া বিশুদ্ধ করেন।

পরে উর্দ্ধে স্বর্গরাজ্যে প্রেরণ করেন। কেহ কেহ বা উৎকট আসক্তি বা বাসনা কামনার বশে ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া নবকলেবর ধারণা করিয়া নূতন মানুষ হয়। কিন্তু তাহাকে আর চেনা যায় না, কেননা সে আবার নূতন মানুষ হইয়া নূতন পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করে। সেইজন্য সে যে সংসার হইতে বিদায় লইয়াছিল, সেই সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলেও আত্মীয় স্বজন তাহাকে চিনিতে পারে না। স্থূল বাসনা কামনায় আবদ্ধ তাহারা সেই নবাগত আত্মীয়স্বজনকেও চিনিতে পারে না, কেননা তাহাদের চিত্ত স্থূল শরীরের সংস্কারে এমনই আবদ্ধ যে নূতন শরীর দেখিয়া নূতন মানুষ বলিয়া মনে করে। আমার কিন্তু সেরূপ হয় না। আমি যে কোন নবাগত সন্তানকে দেখিয়া চিনিতে পারি, এ কোথা হইতে আসিয়াছে কোথায় ছিল, কি করিত। এরূপ অবস্থা তোমারও হইতে পারে, যদি তুমি স্থূলকে উপেক্ষা করিয়া সূক্ষ্মের উপাসক হও। সর্বদা তুমি স্থূলকে আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মের উপাসনাও করিয়া থাক—যেমন প্রথম সাক্ষাতে আমার স্থূলদেহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলে, আজ আর তাহা নাই, আজ তুমি স্থূল ভুলিয়া গিয়া অর্থাৎ তাহার দিকে নজর মন না রাখিয়া সূক্ষ্মের সঙ্গে কারবার করিতেছ, যত কিছু বলিতেছ, শুনিতেছ বা বুঝিতেছ, সে সবই আমার এই স্থূল আমির মধ্যে যে সূক্ষ্ম আমি আছে—তাহারই সঙ্গে। সেইজন্য বলিতেছি, স্থূল সংস্কার ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মের উপাসক হও, সূক্ষ্ম ধারণা কর, সূক্ষ্ম চিন্তা কর, ভাবের সঙ্গে ভাব কর, যে অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইবে—তাহা বলা যায় না। লোকে যে মা বা ঠাকুর দেবতা কত কিসের উপাসনা করে, তাহারা কি সেই মা, ঠাকুর

দেবতার মূর্ত্তিকে দেখিতে পায়? কিন্তু করুণাময়ী বা গুরু দেবতা প্রভৃতি সকলেই একান্ত মনে ডাকিবামাত্র আসেন, আসিয়া মনের মধ্যে সূক্ষ্মভাবরূপে দেখা দেন, তাহা সকলে জানেনা মানেনা বোঝেও না, কেন না, তাহারা সূক্ষ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ করে নাই, সেইজন্য তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা—মরণের পরে কাঁদিয়া আকুল হয়, এমন কি যে মরিল সেও। তাহার কারণ কি? সবই স্থূল সংসারের ফল—যাহাদের আত্মীয়-স্বজনের যে শোক, সে-শোক কেবল স্থূল দেহের জন্য। এই জন্য দেখিয়াছি—আমি আত্মীয়-স্বজন বা অপর কাহারও মৃত্যুতে চোখের জল ফেলি না। আমার স্নেহময়ী গর্ভধারিণী বা আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে কাঁদা তো দূরের কথা, কত আনন্দ করিয়াছি, কত গান গাহিয়াছি, তাহা তুমি জান না, যাহারা সেখানে ছিল, তাহারা দেখিয়াছে। আমি জানি মানুষ মরে না, স্থূল রাজ্য হইতে সূক্ষ্ম রাজ্যে চলিয়া যায়। তুমি দেখ নাই। শোক সকলের সমান নহে। যে যত স্থূলের উপাসক, শোকও তাহার তেমনই, আর যে যত স্থূলের উপাসক নহে তাহার শোকও তেমনি কম। এইজন্য বোধ হয় হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে, শূদ্রের ও ব্রাহ্মণের মধ্যে অশৌচের ব্যবস্থা ভিন্ন। তুমি কি মনে কর মুনি-ঋষিগণ পক্ষপাত-দুষ্ট ছিলেন? তাই তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের খোসামুদী করিয়া ব্রাহ্মণের দশ দিন আর শূদ্রের এক মাসের অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন? মনে রেখো এখনকার ব্রাহ্মণ আর তখনকার—আকাশ-পাতাল তফাৎ।

"আচ্ছা, বল দেখি—বাহিরের সঙ্গে ভিতরের কি সম্বন্ধ? আমি যখন আপিস যাইতাম, তখন আমার আর এক রূপ, আর

এখন এই ছোট্ট একখানা কাপড়, খালি গা। যে ভিতরের দিকে নজর দেয় না, বাহিরের দিকে নজর দেয় তার এই অবস্থা। যে পোষাক-পরা মানুষকে চেনে সে আর খালিগায়ের মানুষ দেখিলে চিনিতে পারে না। মানুষ যে কত স্থূলদৃষ্টি বাহিরের সঙ্গে কারবার, তাহা তুমি এখনকার কোন কোন নামকরা লোকের মধ্যে দেখিতে পাইবে। তাহারা বলে কিনা—বৃন্দাবনের কৃষ্ণ আর কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ আলাদা। যে আদালতে বসিয়া বিচার করে, সে আর বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া কথা বলে না? তাই বলি—স্থূলের শিক্ষাসংস্কার জ্ঞান বিশ্বাস—সব ছাড়, সূক্ষ্মের উপাসনা কর, ভাবের সঙ্গে ভাব কর। তোমাদের দর্শনশাস্ত্র তর্ক বিচার বিবেচনা দিয়া যে ভগবানকে 'অবাঙ্‌মনসগোচর' বলিয়াছে— তাহাকেই তো ভক্তেরা মানুষ করিয়া সকলের সামনে হাজির করিয়া দিল। গর্গ প্রভৃতি মুনি-ঋষিরা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে দেখিতেন, মা যশোদা কি সেই ভাবে দেখিতেন? পণ্ডিত হইও না, আমার মত মূর্খ হও। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'মূর্খ' ছিলেন বলিয়া তিনি মায়ের কোলের ছেলে, তাই মা তাঁহাকে কত লুকান জিনিষ দিয়াছেন—তখনও কত মহা মহা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা শাস্ত্র বিচার লইয়া নিজের জীবন কাটাইয়াছেন—আর তিনি?

"তুমি জান না—আমাকে দিয়া মা তোমাকে যে সব দেখাইলেন, এসব কি মিথ্যা? একবার তোমাদের অ্যানি বেশান্ত দেরাদুনে আমায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, মা, মা, করেন—মাকে দেখাইতে পারেন? আমি বলিলাম—আপনি তত্ত্বদৃষ্টিতে যে সব কথা বলেন সে সব দেখাতে পারেন? আমি তাহা পারি মা'র

কৃপায়। এই বলিয়া মা আমাকে দিয়া তখন যাহা মেমসাহেবকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আপনি আমাদের দলে আসুন। ওরে বাবা, আমি কি বাঁদর? বলে ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম।"

ভারতের অধ্যাত্মদর্শনের অন্যতম গ্রন্থ আয়ুর্বেদ। প্রাচীন-কালে মানুষের বাহির ও ভিতর—শরীর ও মনের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব সকল দেখিয়া দুইখানি গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছিল। একখানিতে শরীর সম্বন্ধে, অপরখানি মনের সম্বন্ধে। উভয়েরই রচয়িতা একই ব্যক্তি—ভগবান অনন্তদেব। তিনি চররূপে পৃথিবীতে আসিয়া 'চরক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তিনিই আবার মানুষের মনকে পৃথকরূপে দেখিয়া যাবতীয় মানসরোগের প্রতিকারক যোগ-শাস্ত্র লিখিয়া পতঞ্জলি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। একই মানুষের বিভিন্ন প্রকার লোকাতীত কর্ম দেখিয়া তাহাকে প্রত্যেক কর্মের কর্ত্তারূপে দেখা এবং তাহা প্রতিপন্ন করা স্বাভাবিক ধর্মের মত, সেই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ আর কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্—একজন নহে, এইরূপ। একই চরক বা পতঞ্জলিকে পৃথক্ করিয়া কেহ কেহ বলেন—চরক ও পতঞ্জলি এক নহে, দুইজন পৃথক্। এই চরক বা পতঞ্জলি বলেন মানুষের শরীরের মধ্যে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় মানুষ বা আত্মা বিভু, অর্থাৎ তিনি সবই দেখিতে পান, শুনিয়াও থাকেন, ইহা আত্মার ব্রহ্মভাবের লক্ষণ। সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে 'পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ'। অর্থাৎ তিনি চক্ষু বিনা দেখিতে পান এবং কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পান। এই অচক্ষু ও অকর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা মনুষ্যশরীরে অবস্থানকালে মনের দ্বারা আবদ্ধ

হইয়া বিভুত্ব হারাইয়া ফেলিয়া চোখের আড়ালে কিছু দেখিতে বা অতি দূরাগত শব্দও শুনিতে পান না, সেইজন্যই মানুষ ইহলোক হইতে পরলোকের কিছু দেখিতে পায় না এবং সেখানকার কোন কথা বা শব্দও শুনিতে পায় না। কিন্তু মানুষের অন্তঃস্থিত আত্মা যদি মনের আবরণ হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে সে চোখের আড়ালে যাহা বিদ্যমান, যেমন পরলোক, তাহা দেখিতে পায়, সেখানকার শব্দ বা কথাবার্ত্তাও শুনিতে পায়। ইহা সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে। চরকসংহিতাতেও তিনি বলিয়াছেন—

"মনসস্তু সমাধানাৎ পশ্যত্যাত্মা তিরস্কৃতম্"।

অর্থাৎ মনকে সমাহিত বা যোগযুক্ত করিতে পারিলে চোখের আড়ালে যাহা আছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের দ্রষ্টা ঋষি মহর্ষিগণ নিত্য সমাহিতচিত্ত যোগী ছিলেন, সেইজন্য আত্মা যখন মনোময় কোষ বা সূক্ষ্ম দেহের সহিত যুক্ত হইয়া দেহ-ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া যাইত বা তাদৃশ মনোময় সূক্ষ্ম দেহের সহিত যুক্ত হইয়া স্থূল দেহ ধারণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিত—তাঁহারা তাহা দেখিতে পারিতেন।

অতএব—যাঁহারা ইহলোকে থাকিয়া পরলোকবাসীদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহেন বা তাহাদিগকে দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য চিত্তকে নিত্য সমাহিত বা যোগযুক্ত করা। সংসারে বিষয়াসক্ত জীবকেও সমাহিতচিত্ত এবং যোগযুক্ত করিবার উপায় ও উপদেশ পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়া গিয়াছেন, যদি কেহ শুদ্ধচিত্ত অর্থাৎ সংসারের সর্বপ্রকার চিন্তা হইতে বিরত হইয়া

প্রত্যহ অভিমত ইষ্টদেবতার পূজান্তে গীতা পাঠ করেন তাহা হইলে তাহার চিত্ত ভগবৎকৃপায় যোগযুক্ত হইবে। এইরূপ করিতে করিতে তিনি কত অদৃষ্টপূর্ব বস্তু বা লোক দেখিতে বা অশ্রুতপূর্ব শব্দ বা কথা সকল শুনিতেও পাইবেন, ইহারই নাম দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতি।

আমার মনে হয়, এখনও যে সকল ব্যক্তি অসাধারণ বা মহা অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা সাধারণ লোকের চিত্তকে ভগবদভিমুখী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এই যোগবিভূতি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। লোকে আধুনিক প্রথায় পরলোকবাসীগণের সহিত ইহলোকবাসীদিগের সম্বন্ধ স্থাপনের যে উপায় সকল আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পরিপন্থী, তাহাতে মানুষের চিত্তবৃত্তি ভগবদভিমুখী হয় কিনা সন্দেহ।

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন—"মরণের পরে" লিখিতে বসিয়া আমি মরণের পূর্বে যে সকল বিষয় লিখিয়া বসিলাম—তাহাতে অনেকেই হয়ত দুঃখিত হইবেন, কিন্তু তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। সকলেই জানেন, সকল দেশের লোকেরই কতকগুলি নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম আছে, সে সকল ত্যাগ করিলে তাহাদের আর আপন বলিয়া অভিমান বা গৌরব করিবার কিছুই থাকে না। আমি চিকিৎসাক্ষেত্রে দেখিয়াছি—যাহার যাহা প্রকৃতি, তাহার অনুরূপ তাহার শরীর ও মন। সেই অনুরূপ শরীর ও মনকে অন্যরূপ করিয়া দেয় রোগে। চিকিৎসক আসিয়া তাহার সেই বিকৃত শরীর ও মনকে তাহার প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া দিয়া থাকেন, অপরের

প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া দেন না। কেন না তাহাতে তাহার বিনাশ ঘটে, এই বিনাশই মরণের পরে ঘটিয়া থাকে, পূর্বে নহে। এইজন্য চিকিৎসক রোগীর প্রকৃতির অনুরূপ শরীর ও মনের অবস্থা করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ বা নীরোগ করিয়া থাকেন। আমি তাদৃশ কর্মে বহুকাল ব্যাপৃত ছিলাম। সেইজন্য আমি মরণের পরে লিখিতে বসিয়া এমন কিছু লিখিয়া বসিয়াছি—যাহাতে আমাদের দেশের লোক আবার প্রকৃত আমাদের দেশের লোকের মত হইয়া প্রকৃত ভারতীয় ভাবের পরিচয় দিতে পারে—ইহার জন্য। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ, তৎ তৎ এবেতরো জনঃ"—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ করেন, সেই সকল ইতরজন অনুবর্ত্তন করে। বর্ত্তমান স্বাধীন ভারত কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহা ভারতীয়গণ এতৎদেশীয় দৃষ্টির দ্বারা দেখিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা। "ক্ষন্তব্যা মেঽপরাধাঃ"।

সমাপ্ত

———